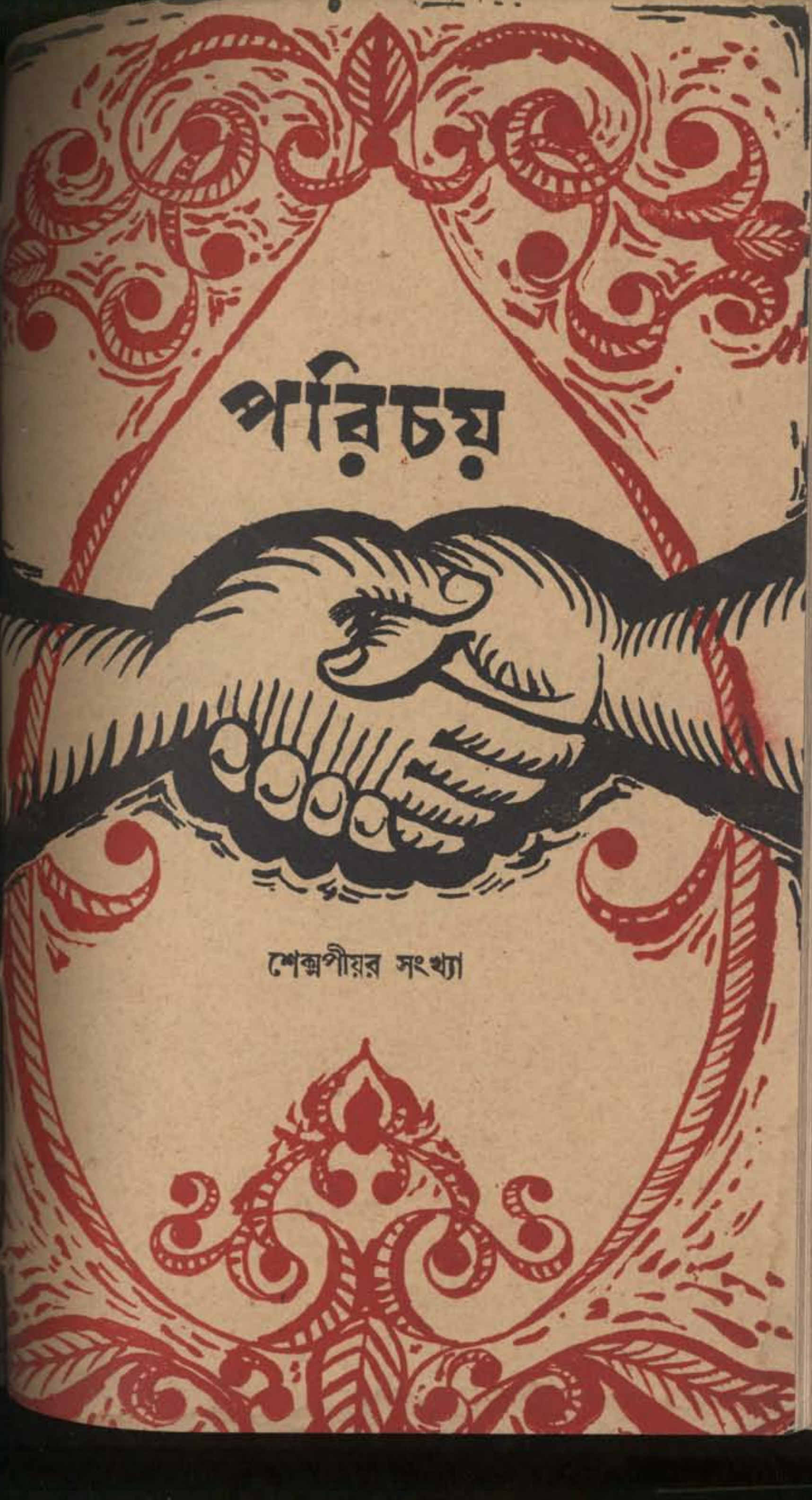
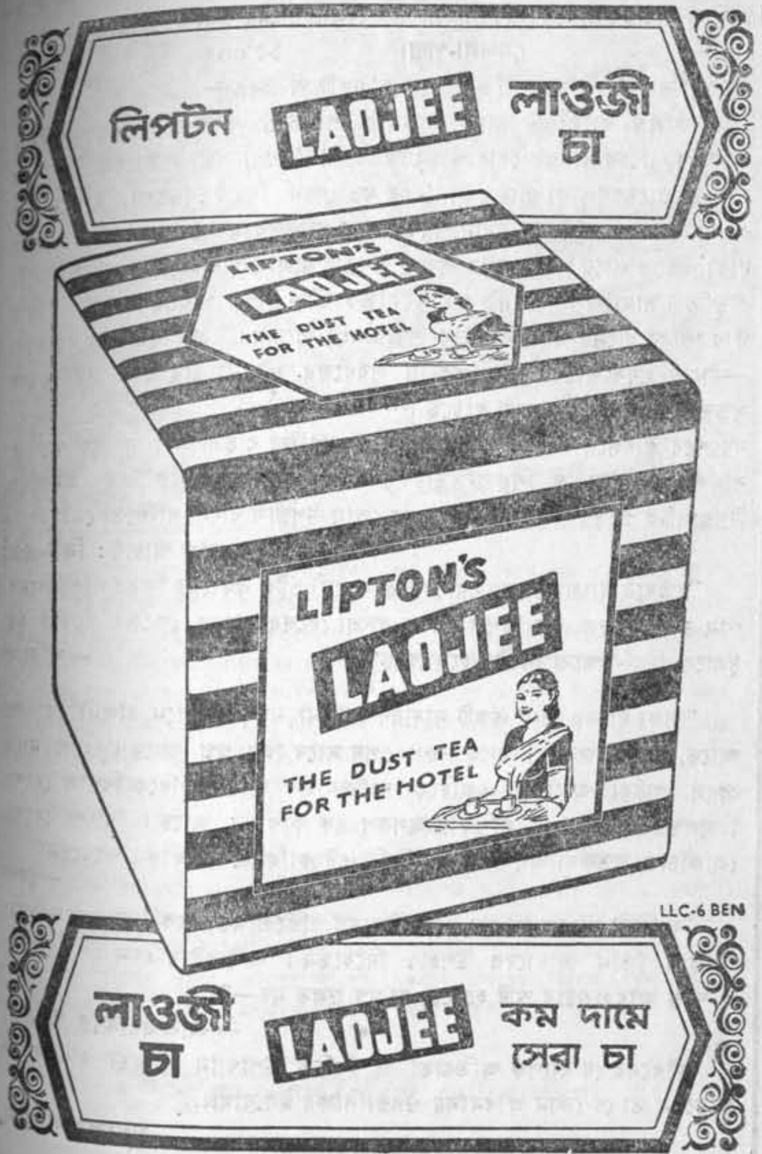

পরিচয়
শেক্সপীয়র সংখ্যা


নববর্ষে পূর্ব রেলওয়ে-র শুভেচ্ছা


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
৬ ড্রাম মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার ড্রাম মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাশি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অব্যর্থ ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও বলকারক টনিক দুটি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং বর্ধিত স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
Mritasanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।


লিপটন LAOJEE লাওজী চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LLC-6 BEN
লাওজী চা LAOJEE কম দামে সেরা চা





এঁদের
পেছনে
দাঁড়ান
সীমান্তের জওয়ান ভাইদের
সহায়তায়
এগিয়ে আসুন
আমাদের সীমান্তে এখনও আক্রমণের হুমকি। সেই হুমকির যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্যই আজ যার যেমন ক্ষমতা তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে।
দেশরক্ষার খরচ মেটে, দেশবাসীর দেওয়া বছরকরের ট্যাক্সের টাকা থেকেই। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত সরকারী ট্যাক্স তাড়াতাড়ি ও পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া।
আপনার ট্যাক্সের টাকাই দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি
পশ্চিম বঙ্গ সরকার
দ্বারা প্রচারিত
RUPEE
1950
KALPANA

ভারতের নৃত্যকলা । গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়



ভারতের নৃত্যকলা প্রসঙ্গে প্রথিতযশা শিল্পীর গবেষণা-মূলক এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রয়াস। মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাম ঃ বারো টাকা

● কয়েকটি মতামত ●

নৃত্যকলা প্রসঙ্গে এমন সুলিখিত তথ্যমূলক গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় বিরল। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য লেখিকাকে অভিনন্দন জানাই। —**লক্ষ্মীশংকর।**

দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই অনন্য গ্রন্থে আলোচনার ব্যাপকতা, তত্ত্ব ও তথ্য সমাবেশের প্রামাণ্যতা লেখিকার গভীর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বহন করে।
—**সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।**

পঞ্চসহস্রবর্ষব্যাপী ক্রমবিকশিত নৃত্যকলার ইতিহাস। আঙ্গিক ও শাশ্বত স্বরূপসত্তা এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। —**কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি।**

নৃত্যকলার ইতিহাস, ব্যাকরণ, দর্শন ও বিভিন্ন আঙ্গিকের আলোচনাসমৃদ্ধ এই গ্রন্থের উৎকর্ষে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। —**বালকৃষ্ণ মেনন।**

ভারতের নৃত্যকলা, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বহুবিচিত্র তথ্যের সমাবেশে চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যে আমাকে মুগ্ধ করেছে।
—**অনাদিকুমার দস্তিদার।**

ভারতীয় নৃত্যের কুশলী শিল্পী এই গ্রন্থে শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সব তথ্যই সুন্দরভাবে বহু ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক নৃত্যশিক্ষার্থীকে আমি এই গ্রন্থ পড়তে বলি। —**গুরু নদীয়া সিং।**

নবপত্র প্রকাশন । ৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯

প্রকাশিত হ'ল—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস — **জয়ন্তী** ৩·০০

ডঃ নীরোদবরণ চক্রবর্তীর — **বিচিত্র বিবেকানন্দ** ২·২৫

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুবৃহৎ উপন্যাস — **পৌষ ফাগুনের পালা** ১৫·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন উপন্যাস — **কালো হরিণ চোখ** ১০·০০

শংকর-এর

চৌরঙ্গী ১০·০০ — একাদশ সংস্করণ

পাত্র-পাত্রী ২·৫০ — ৩য় সংস্করণ

এক দুই তিন ৪·০০ — নবম সংস্করণ

প্রকাশিত হ'ল — নিঃশেষিত প্রায়

বনফুলের — **মন্ত্রমুগ্ধ** ৩·০০ — **দূরবীণ** (২য় সং) ৪·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের — **নিশিপদ্ম** (৫ম সং) ৪·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য সংকলন — **শরৎ-নাট্যসংগ্রহ** (১ম খণ্ড) ৫·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের — **দুই পাখি** ৩·৫০

সতীনাথ ভাদুড়ীর — **আলোক দৃষ্টি** ৩·৫০ — **জলভ্রমি** ৩·০০

বিমল মিত্র রচিত — **স্ত্রী** (৩য় সং) ৪·০০

জরাসন্ধের — **মসিরেখা** (৩য় সং) ৯·০০ — **আশ্রয়** (৫ম সং) ৩·৫০ — **পাড়ি** (৭ম সং) ৩·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — **হসন্তী** (২য় সং) ৪·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের — **গরীয়সী গৌরী** (২য় সং) ৪·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের — **কুয়াশা** ৩·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর — **শ্রেষ্ঠ গল্প** (৩য় সং) ৫·৮০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের — **দ্বিতীয় অন্তর** ৯·৫০

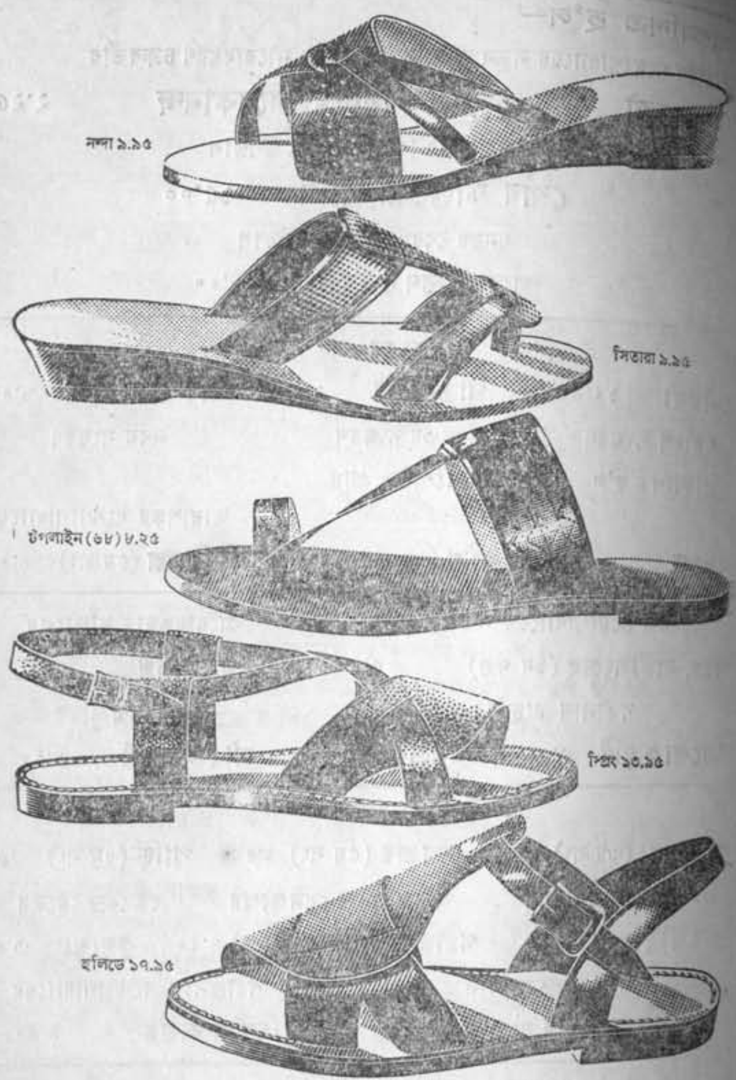
শ্রীনিরপেক্ষ-র — **নেপথ্যদর্শন** (২য় সং) ৭·৫০

দেবজ্যোতি বর্মণের — **আমেরিকার ডায়েরী** ৭·৫০

নীলকণ্ঠের — **ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে** (২য় সং) ৩·৫০

প্রাণতোষ ঘটকের — **রোজালিণ্ডের প্রেম** ৩·০০

বাক্-সাহিত্য ঃ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফোন ঃ ৩৪-৭৪৩৫



পরিচয়

শেক্সপীয়র সংখ্যা

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ১০—
বৈশাখ, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট—সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



উইলিয়ম শেক্সপীয়র

জন্ম : ২৩শে এপ্রিল, ১৫৬৪ মৃত্যু : ২৩শে এপ্রিল, ১৬১৬

শেক্সপীয়র-স্মরণে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধু পারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছু কাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গনে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য-বন্দনা-সঙ্গীতে।
তারপর ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে ;
নিয়ছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্র দেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাষিয়া ; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

বাঙালীর শেক্সপীয়র প্রেম

'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'—এই বলিয়া শেক্সপীয়রকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একজন প্রধান কবি। ভারত সাম্রাজ্য ও শেক্সপীয়রের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলে ইংল্যাণ্ড শেষোক্তকেই বাছিয়া লইবে কারলাইলের এই ব্যবসাদারী হিসাব অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড ও ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূক্ষ্মতর উপলব্ধি প্রতিভাত হইয়াছে এই বাক্যে। ইহা তো সুবিদিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস এমন এক কূলপ্লাবী ভাবাবেগের ফল যাহাতে দুইটি লক্ষ্য একাকার হইয়া গিয়াছিল। তাহার একটি হইল পশ্চিম হইতে আনীত নতুন বিজ্ঞান ও মানববাদের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা আর অপরটি পরাধীনতা সম্পর্কে তেমনই সুতীব্র জ্বালাবোধ যাহারই ফল পরিণাম ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত। শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে কালিদাসের উল্লেখ তাই আকস্মিক নয়। নাট্যকার হিসাবে কালিদাসও বিশ্ব-পরিচিতি দাবি করিতে পারেন। গ্যয়টে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠতম শ্লোকে কালিদাসের 'শকুন্তলা'র প্রতি এই বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন :

Willst du die Bl*u*te des fr*u*hen
die Fr*u*chte des sp*a*teren Jahres,
Willst du was reizt und entz*u*ckt
willst du was s*a*ttigst und n*a*hrt,
Willst du den Himmel, die Ende,
mit einen Namen begreifen
Nenn'ich Sakuntala, Dich
und so ist Alles gesaget.

(কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।)*

বাঙালী কবির কাছে অবশ্য কালিদাস তাঁর শত মাধুর্য সত্ত্বেও বিগত যুগের প্রতিনিধি, শেক্সপীয়র মহত্তর কেননা তাঁর রচনায় জীবন্ত বাস্তবের হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায়।

শেক্সপীয়র সম্পর্কে এই গভীর শ্রদ্ধা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম চারিত্র্য-লক্ষণ আর তা পুষ্ট হইয়াছিল কলিকাতা হিন্দু কলেজ ও তার শিক্ষার প্রভাবাধীনে। আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অনিবার্য সীমা নির্দেশক হইল এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা। "হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের উদারনৈতিক শিক্ষা দানের" জন্য বহু ব্যক্তির চাঁদায় এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। পরিকল্পনাটির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি ইহার সমর্থনে দাঁড়ান নাই। তাঁহার ভয় ছিল তাহা হইলে "রক্ষণশীল দেশবাসীর সংস্কার আহত হইবে এবং তাহার ফলে সমগ্র কাজটিই পণ্ড হইবে।" ১৮১৬ সালের ২৭শে আগস্ট দাতাদের এক সাধারণ সভায় পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেটা ছিল শেক্সপীয়রের মৃত্যুর দ্বিতীয় শতবার্ষিকী বৎসর। মাত্র কুড়িজন ছাত্র লইয়া কলেজটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সোমবার, ২০শে জানুয়ারি, ১৮১৭। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তখন দুইটি ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। তাহার মধ্যে ইংরাজী ছিল আবশ্যিক। ফলতঃ পরবর্তী দশ বছরে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইল। ১৮২৭ সালে কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের পড়িতে হইত পোপ-এর কবিতা-সংগ্রহ, 'ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড', 'প্যারাডাইজ লস্ট' ও শেক্সপীয়রের নাটকাবলী। ১৮৩১ সালে জেনারেল কমিটির বিবরণীতে লেখা হইল "ইংরাজী ভাষার উপর এতটা দখল অর্জিত হইল এবং ঐ ভাষার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এতটা পরিচিতি সাধিত হইল যে ইওরোপের বিদ্যালয় সমূহে কদাচিৎ তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে।"

এই চমকপ্রদ সাফল্যের জন্য অনেক পরিমাণেই দায়ী ছিল ১৮২৮ সালের ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও'র নিয়োগ। এই পদ যখন লাভ করেন তখন ডিরোজিও'র বয়স মাত্র উনিশ

* রবীন্দ্রনাথ কৃত সারানুবাদ

বছর। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তিনি অচিরাৎ সাফল্য লাভ করিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, "তাঁর সময়ের আগে বা পরে ভারতবর্ষের কোনো দেশীয় শিক্ষায়তনের কোনো শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের উপর এতটা প্রভাব কোনোদিন বিস্তার করিতে পারেন নাই। শুধু ক্লাশঘরে শিক্ষাদানের সময়েই নয়, ডিরোজিও'র অমায়িক স্বভাব, অদম্য উৎসাহ, পরিহাসবোধ, অধ্যয়নের ব্যাপ্তি, শিক্ষাদানের আগ্রহ, ধৈর্য ও সৌজন্যবোধ ছাত্রদের হৃদয় জয় করিয়াছিল, অর্জন করিয়াছিল তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা। শিক্ষাদানের অবসর সময়েও তিনি আলাপ-আলোচনায় ছাত্রদের অধ্যয়নে সাহায্য করিতে সদা-প্রস্তুত ছিলেন, ক্লাশঘরের পড়া-শুনার মধ্যে যে-সব প্রসঙ্গ উঠিত সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দিতেন। ক্লাশ শুরু হইবার আগে, কখনও বা দিনের কাজের শেষে ক্লাশের পড়া ছাড়াও ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ব্যাপকতর ও গভীরতর করিবার জন্য ডিরোজিও ইংরাজী সাহিত্য হইতে ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইতেন। হিন্দু কলেজের যে-কোনো ছাত্রই তাহার এই "স্বেচ্ছাবৃত কর্মভারের সুযোগ লইতে পারিত।" ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস এই যে শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সাফল্যই ডিরোজিও'র পতনের কারণ হইল। মুক্ত চিন্তায় তাঁহার উৎসাহদান হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নীতিহীনতার এক আজগবি অভিযোগ আনা হইল। প্রতিবাদে ১৮৩১ সালে ডিরোজিও পদত্যাগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সম্ভ্রমবোধ ও চারিত্র্যগুণে চেস্টারফিল্ডকে লেখা ডঃ জনসন বা ১৯১৯ সালে ভাইসরয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রের মতো ইংরাজী ভাষার সুবিখ্যাত পত্রগুলির সঙ্গে তাহা তুলিত হইতে পারে।

হিন্দু কলেজের সহিত তাঁহার সাহচর্যের কথা বাদ দিলেও, ডিরোজিও বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। তাঁহাকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কোনো বিবরণ রচনা করিতে গেলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। এক পর্তুগীজ ব্যবসায়ী আর বিহারের জনৈক নীলকরের ভগিনী এক ইংরাজ রমণীর পুত্র ডিরোজিও তাহার প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে না হইতে বিখ্যাত হইয়া পড়েন। তখন তাহার বয়ঃক্রম মাত্র অষ্টাদশ বৎসর। সেই হইতে যৌবনের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া তিনি সাহিত্য-সেবায়

মনোনিবেশ করিলেন। সেকালে যে সমস্ত বিষয় মানুষের চিত্ত আলোড়িত করিত তাহার প্রায় সবগুলি লইয়াই তিনি গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়া চলিলেন অবিশ্রান্তভাবে। আশ্চর্যের বিষয়, কলিকাতার কোনো একটি বে-সরকারি বিদ্যালয়ে ছয় হইতে চৌদ্দ, মাত্র এই আট বছর, তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু কবি হিসাবেই ডিরোজিও অমরত্বের দাবি করিতে পারেন। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার সেই আবেগবিদ্ধ বাক্যের জ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। ১৮৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ডিরোজিও পরলোক গমন করেন। কিন্তু কে ভুলিতে পারিবে ভারতবাসীর কাছে স্বাদেশিকতার তাঁর সেই উদ্দীপনাময় আহ্বান? তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম কবি-পথিকৃৎ, কাব্যিক রেনেসাঁসের যা ছিল একটি মূল সুর।

TO INDIA—MY NATIVE LAND

My Country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou;
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery.
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime.
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! One kind wish from thee!

মধুসূদন দত্ত যখন ছাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজে আসিলেন তখন ডিরোজিও আর সেখানে ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি তখনও জাগরুক ছিল। হিন্দু কলেজের এই সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছাত্রটির, যিনি পরবর্তী জীবনে আধুনিক

বাংলা কবিতার জনক হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই মহান শিক্ষকের কি যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। মাইকেল যেহেতু মুক্ত ছন্দে বীররসাক্রান্ত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেহেতু সাধারণত তাঁহাকে মিলটনের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মেজাজ এবং জীবনযাত্রার ধারার দিক হইতে মার্লোর সহিতই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তিনি আবার, আধুনিক অর্থে, আমাদের প্রথম নাট্যকারও এবং বাঙলায় জাতীয় রঙ্গশালা আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোধা। ছাত্র হিসাবে মধুসূদন কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রভাবাভিভূত হন। রিচার্ডসন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ১৮১৯ সালে বেঙ্গল আর্মির ক্যাডেট হিসাবে কিন্তু দশ বছর পরে শারীরিক অসামর্থ্যের দরুন অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, নিবন্ধকার ও সাংবাদিক আর শিক্ষণ-প্রতিভা যে তাঁহার সহজাত ছিল তিনি অচিরাৎ তাহারও প্রমাণ দিলেন। একদিন হিন্দু কলেজের ছেলেদের তিনি যখন ওথেলো পড়াইতেছিলেন মেকলে তাহা শোনেন। তিনি পরে রিচার্ডসনকে বলিয়াছিলেন : 'আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আর সব কিছুই হয়তো ভুলিয়া যাইব কিন্তু কখনও ভুলিব না তোমার শেক্সপীয়র পড়ান।' মধুসূদন ছিলেন ডি. এল. আর-এর—ছাত্র-মহলে তিনি ঐ প্রীতিপূর্ণ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন—একনিষ্ঠ শিষ্য। আর অনুকরণ যদি সনিষ্ঠ অনুরাগের নিরিখ হয় তবে সে পরীক্ষায়ও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন। গুরুর হস্তাক্ষর অনুকরণ করিতে না পারা পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নিজের কবিত্ব-প্রতিভা সম্পর্কে সদা-সচেতন এবং রিচার্ডসনের মতো শিক্ষকের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ মাইকেল শেক্সপীয়রের প্রতি আজীবন অনুরাগ পোষণ করিতেন। চাহিলে শেক্সপীয়র নিউটন হইতে পারিতেন সতীর্থদের কাছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সহজাত অনীহা সত্ত্বেও গণিতের রহস্যভেদের জন্য একবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন এবং সত্য সত্যই এক পরীক্ষায় অঙ্কে বহু নম্বর পাইয়া বন্ধু ও শিক্ষকদের তাক লাগাইয়া দিলেন। পরে তিনি ল্যাতিন, গ্রীক, ইতালিয়ান ও ফরাসী ভাষা সহ আট-নয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী দারিদ্র্য-নিপীড়িত মাইকেল যখন তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী, ফরাসী রমণী যাহাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসিতেন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন

শেক্সপীয়রের সেই সুপরিচিত পংক্তিগুলিতেই, লেডি ম্যাকবেথের আকস্মিক মৃত্যুর পর ম্যাকবেথ যাহাতে জীবন-মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনপ্রয়াসী হন।

রিচার্ডসনের প্রাণবন্ত শেক্সপীয়র পাঠন খুবই সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্রেরা শুধু পরীক্ষা-পাশের জন্য শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, তাহারা ঘরোয়াভাবে শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতেন, আয়োজন করিতেন শৌখিন অভিনয়ের। এমন কি রিচার্ডসনের আগেও বাংলার শিক্ষিত-সমাজের যাহারাই হিন্দু কলেজ মারফৎ শেক্সপীয়র ও ইংরাজী নাটকের সহিত পরিচিত হন এবং ইংরাজী রঙ্গশালার অভিনয় দেখেন তাহারাই নাটক সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠেন। ইহারই ফলস্বরূপ জন্ম হইল 'হিন্দু থিয়েটার'-এর। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জুলিয়াস সীজারের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী লইয়া এই রঙ্গশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই রঙ্গশালা ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল কিন্তু ইহার প্রেরণা সহসা নির্বাপিত হয় নাই। ১৮৪৮ সালে আমরা দেখিতে পাই একজন বাঙালী অভিনেতা বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য কলিকাতার ব্রিটিশ থিয়েটার Sans Souci-তে ওথেলোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৮৫৩ সালে দেখি বাঙালী তরুণদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ওথেলো নাটকের ইয়াগোরূপী বাবু প্রিয়নাথ দে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করিলেন। পরবর্তী বৎসরে তাঁহারা 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। পোর্সিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন মিসেস গ্রীগ নামে এক ইংরাজ মহিলা। ১৮৫৫ সালে তাঁহারা আবার দর্শক সাধারণের সামনে উপস্থিত হইলেন—এবারে একটি অচলিত নাটক লইয়া। তাহা হইল শেক্সপীয়রের 'হেনরি দি ফোর্থ'।

১৮৫৫ সালের বাংলার শিক্ষা-ইতিহাসে এক রূপান্তরের যুগ শুরু হইল। এই বছর শুধু হিন্দুদের জন্য বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু কলেজের অস্তিত্বের অবসান ঘটিল। সরকার ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইহার দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইল। প্রায় একই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইল ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ২৩ জন ছাত্র এই পরীক্ষায় বসিলেন এবং সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

মধুসূদন যেমন ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জনক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক। মধুসূদনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও মাতৃভাষা ব্যবহারের পূর্বে ইংরাজী ভাষায় সাহিত্যরচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৬৫ সালে প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পর হইতে ১৮৯৪ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার প্রথম উপন্যাসের সহিত 'আইভানহো'র আপাতসাদৃশ্যের কারণে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহাকে সাধারণত স্যার ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাঁহার উপন্যাস শেক্সপীয়রের নাটকের নিকটতম। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। অদ্যাপিও তাহারা প্রভূত জনসমাদরধন্য। বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন (কপালকুণ্ডলা) "বিশুদ্ধ" নারীত্বের চিত্ররূপ হিসাবে যাহা শেক্সপীয়রের মিরাণ্ডার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে।

বাংলা অনুবাদে শেক্সপীয়রের নাটক পরিবেশনের কিছু কিছু প্রয়াস সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখন-সখন করা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রয়াসের সাফল্য খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালী শিক্ষিতসমাজ যে কারণেই হউক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। ইহার একটা কারণ হয়তো এই যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শেক্সপীয়র পাঠন ও শৌখীন ও পেশাদার দলের অভিনয় বিপরীতমুখী খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কোলরিজ ও ল্যাম যে ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্র্যাডলের কাছে যাহা অবিসংবাদী প্রামাণিকতা লাভ করিয়াছে তাহার অনুসরণে শেক্সপীয়রের নাটকাবলী আদর্শ নাটকীয় কাব্য হিসাবেই পড়ান হইত—যাহার রসগ্রহণ করিতে হয় এককভাবে অনুভবের মধ্য দিয়া—রঙ্গমঞ্চে পরিবেশনের বাস্তব সমস্যা ও দর্শকসাধারণের সমবেত প্রতিক্রিয়ার সহিত তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিবর্জিত। ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনেতাদের প্রতি অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সিভালের মনোভাব। কোনো এক ছাত্রের কাছে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন: "রঙ্গালয়ের লোকেদের শেক্সপীয়র

সমালোচনায় আস্থা স্থাপন করিও না। তুমি-আমি শেক্সপীয়র পড়ি ও অনুভব করি; উহারা শেক্সপীয়র অভিনেতা, উহারা অনুভবের ভান করে।"

অধ্যাপক পার্সিভাল ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র-বিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকারী। ১৮৫৫ সালে চট্টগ্রামে এক ভারতীয় খ্রীষ্টান পরিবারে তাহার জন্ম। তিনি বিলাত যান ১৮৭৩ সালে। সেখানে ধ্রুপদী বিদ্যায় ও ফরাসী ভাষায় উচ্চসম্মান লাভ করিয়া তিনি স্নাতক হন। লণ্ডনে ধ্রুপদী বিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে অধ্যাপক ব্ল্যাকির উচ্চতর গ্রীক ক্লাস ও এডিনবরায় অধ্যাপক সেলারের "অগ্রসর ছাত্রদের" ল্যাতিন ক্লাসে যোগ দেন। ১৮৭৯ সনে তিনি এই পরীক্ষায় সোনার পদকের ঠিক পরবর্তী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি হেনরি মরলে'র অধীনে ইংরাজী সাহিত্য ও ক্রুম রবার্টসনের অধীনে দর্শনের ক্লাসেও অধ্যয়ন করেন। তদুপরি তিনি নিয়মিত পাঠের অবসরে এডিনবরায় প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার পাঠক্রমও শেষ করেন এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন হইতে সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেন। ক্লাসে লেকচার দিবার সময় অবশ্য বিদ্যা জাহীর করিবার কোনোরূপ চেষ্টা তিনি করিতেন না। দুর্বোধ্য অংশকে বা সুদূরতম অনুষঙ্গও তিনি কখনও এড়াইয়া যাইতেন না। যদিও তিনি শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞরূপেই সমধিক পরিচিত ছিলেন তথাপি বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার-কৃত মিলটনের স্যামসন অ্যাগনিষ্টিস ও স্পেনসরের ফেয়ারী কুইন-এর সংস্করণগুলি হইতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার সাহিত্যগত ও ভাষাতাত্ত্বিক গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ার বিষয়ে তাঁহার লেকচারগুলি ছাত্রদের এক নতুন সৌন্দর্যের জগতে লইয়া যাইত, যে জগতে নিকৃষ্ট সমালোচকদের প্রবেশাধিকার নাই। তিনি কখনও অন্য লোকের অভিমতের বাহক ছিলেন না। বলিতে কি তিনি ১৯২৬ সালের পূর্বে শেক্সপীয়র সম্পর্কে ক্রোচে বা ব্রাডলের বই পড়েন নাই। তখন তিনি কর্মে অবসর লইয়া লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। "ইণ্ডিয়ান শেক্সপীয়র" সিরিজের বইগুলি প্রকাশের দায়িত্ব লইবার পরই তিনি ঐগুলি পড়িয়াছিলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মনে সংশয় ছিল হয়তো তাঁহার এতদিনকার ধ্যানধারণা সব নস্যাৎ হইয়া যাইবে। তাই কিছুটা স্বস্তির সঙ্গেই পরে তিনি

বলিয়াছিলেন: "তাহা হয় নাই।" ক্রোচে এবং ব্রাডলে সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যগুলি উদ্ধারযোগ্য :

"Croce's biggest fault is that he forgets his own standard—to judge Shakespeare by our emotions—and becomes metaphysical now and then (he is a Hegelian). But so is Bradley now and then, without rising to any height that Croce reaches. Bradley is painstaking, has read Shakespeare carefully, draws his conclusions conscientiously ; but what he so draws and states might have been stated effectively in one-fourth of the space he takes up. He does not understand the minor character in *Macbeth* and misunderstands the scene between Macduff and Malcolm. I see he uses those crutches, the tests, (down to decimals on the subject of "stopped" an "unstopped" I think)—crutches that people who can walk reverently on their own two legs behind Shakespeare should disdain to use."

একুত্রিশ বছর একাদিক্রমে চাকুরী করিবার পর অধ্যাপক পার্সিভাল ১৯১১ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গুরুর প্রতি তাঁহার একাগ্র নিষ্ঠার মধ্য দিয়া তাঁহার স্মৃতি পরবর্তীকালের ছাত্রসমাজের মধ্যে জাগাইয়া রাখেন। ১৯১৫ সাল হইতে পরবর্তী পঁচিশ বৎসরকাল তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক ঘোষ অবশ্য অধ্যাপক পার্সিভালের মতো মহাকোবিদ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার এমন একটি গুণ ছিল যা তাঁহার গুরুর ছিল না। তিনি শেক্সপীয়র পড়িতেন চমৎকার। এদিক দিয়া তিনি রিচার্ডসনের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই গুণটি আরও চমৎকৃত করে যখন মনে করি তাঁহার অধিকতর বিখ্যাত পূর্বসূরী ডিরোজিওর মতো তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল পুরাপুরি কলিকাতাতেই। পার্সিভালের প্রতি আনুগত্য সত্বেও অধ্যাপক ঘোষ তাহার ক্লাশকে রঙ্গমঞ্চের নিকটতর করিয়াছিলেন, নাটক পাঠনের প্রাণস্পন্দিত অন্তঃস্থলে পৌঁছিয়া ছিলেন। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু বাংলা দেশের

বিভিন্ন কলেজে আজ যাঁহারা শেক্সপীয়র পড়ান তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার ছাত্র এবং ছাত্র বলিয়া গর্বিত।

বিদ্যালয়ের বাহিরেও বাংলাদেশে একনিষ্ঠ শেক্সপীয়র অনুরাগীর সংখ্যা কম নহে। আমাদের নাট্যকারেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শেক্সপীয়র অনুরাগ তাঁহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ যাঁহারা তাঁহার মূল রচনা পাঠ করিয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা তাঁহার রচনাবলীর যথাযথ অনুবাদ আজ অবধি হয় নাই। অনুবাদ কিছু আছে কিন্তু তাহা প্রায়শই সন্তোষজনক নহে। শ্রীঋষি দাস-কৃত তাঁহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত মাত্র কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হইয়াছে। দেরীতে হইলেও ইহাকে শুভ সূচনা বলিতে হইবে। কয়েক বছর আগে বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদও স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদের উদ্দেশ্য :

শেক্সপীয়রের রচনাবলীর যথাযথ বাংলা তরজমা প্রকাশ করা ;

বাংলা টীকা, টিপ্পনি ও ভূমিকা সহ সম্পাদিত শেক্সপীয়রের রচনাবলী প্রকাশ ;

স ধারণ রঙ্গমঞ্চে বাংলা তরজমায় শেক্সপীয়রের নাটক পরিবেশন ;

বিভিন্ন নাটকদলের সহযোগিতায় বাংলা এবং ইংরাজীতে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা।

এই সমিতির প্রস্তুতি কমিটিতে যোগ দিয়াছিলেন কয়েকজন প্রথম সারির অভিনেতা। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী যিনি কলেজে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা ছাড়িয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক হইয়াছিলেন এবং শেক্সপীয়র সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ ছাত্র উৎপল দত্ত যিনিও রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রকে বরণ করিয়াছেন। আর ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, লীলা মজুমদারের মত সাহিত্যিকবৃন্দ, অধ্যাপক পি-কে গুহ, ডঃ এম. এম. ভট্টাচার্য, ডঃ এস. সি. সেনগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকেরা। সমিতি বিশেষ সাফল্যের সহিত কয়েকটি শেক্সপীয়র পাঠের বৈঠক আয়োজন করেন। ভারতের সঙ্গে শেক্সপীয়রের যোগাযোগের যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন সমিতি তাহাদের কর্মকাণ্ডে তাহাকে রূপ দিতে পারিবে বলিয়া আশা রাখে।

শেক্সপীয়রের মৃত্যুর তৃতীয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯১৬ সনে যে Book of Homage to Shakespeare প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাহাতে ইংরাজী অনুবাদ সহ একটি বাংলা সনেট রচনা করিয়া

দিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার ইংরাজী রচনাবলীর মধ্যে এই ইংরাজী তরজমাটি স্থান পায় নাই :

"When by the far-away sea your fiery disk appeared from behind the unseen, O poet, O Sun ; England's horizon felt you near her breast, and took you to be her own.

"She kissed your forehead, caught you in the arms of her forest branches, hid you behind her mist mantle, and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow-flowers.

"A few early brids sang your hymn of praise while the rest of woodland choir were asleep.

"Then at the silent beckoning of the Eternal you rose higher till you reached the midsky, making all quarters of heaven your own.

"Therefore at this moment after the end of centuries, the palm groves by the Indian seas raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise."*

* মূল ইংরাজী হইতে লেখকের অনুমতিক্রমে অনূদিত

শীতাংশু মৈত্র

বাংলায় শেক্সপীয়র-চর্চা

বাংলায় শেক্সপীয়র-চর্চা বড় একটা হয় নি। শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদের প্রয়াস সেই 'ভানুমতীচিত্তবিলাস'-এর যুগেই শুরু হয়ে আজও চলেছে কিন্তু শেক্সপীয়র আলোচনার কোনো ধারা তো এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ই নি, এমনকি কোনো একজন সমালোচকও শেক্সপীয়রের নাট্যকলার পূর্ণাঙ্গ কি খণ্ডিত আলোচনা করেন নি। স্তুতি, বিশেষ করে পদ্যে, কিছু কিছু আছে; অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে কোথাও কোথাও একটু-আধটু শেক্সপীয়র বা রেনেসাঁস সাহিত্যের কথা উঠেছে; আর যাঁরা তাঁর নাটকের অনুবাদ করেছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই একটি করে ভূমিকা লিখেছেন। মধুসূদনের যুগের আগে থেকেই বাংলার নাট্যকারদের কাছে শেক্সপীয়র প্রিয়। পণ্ডিত নাট্যরসিকেরা তাঁকে অনুবাদ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপকেরা শেক্সপীয়র-পাঠনে কৃতিত্ব অর্জন করা গৌরবের মনে করে থাকেন এখনও। তাই D. L. Richardson থেকে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত এখনও বিদগ্ধজনের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়র কখনও স্থায়ী প্রবেশাধিকার লাভ করলেন না—না মূলে না অনুবাদে। তাই শেক্সপীয়র-চর্চাও এখনও কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তাঁকে নিয়ে কোনো আলোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠল না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন, আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও আধুনিক নাটকের গোড়াপত্তন তখন একদিকে প্রতীচ্য (অর্থাৎ ইংরেজি) প্রভাব আর একদিকে সংস্কৃত প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল এবং প্রতীচ্য প্রভাবের প্রধান অঙ্গ ছিলেন শেক্সপীয়র। তাঁকে অনুবাদ করা থেকে আরম্ভ করে, তাঁর নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের কথা, চরিত্র, এমনকি নাটকের ঘটনা-সংস্থানও অনুকরণ করা ডি. এল. রায়, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত চলে এসেছে।

যদিও সংস্কৃত নাটকের রূপকল্পনার সঙ্গে প্রতীচ্য নাটকের রূপকল্পনা মেলে না—(ভরতের সঙ্গে এ্যারিস্টট্‌লের চিন্তাধারার আপাতদৃষ্টিতে মিল খুঁজে পাওয়া ভার—এবং শেক্সপীয়রের নাট্যকলা এ্যারিস্টটেলিয়ানও নয়, সেনেকানও নয়, গুয়ারিনির তত্ত্বানুসারীও নয়) তবু এই দুই ধারার নাটকই কিছুদিন পাশাপাশি চলে, ইংরেজি-শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে প্রতীচ্য প্রভাবই বাংলা মঞ্চে স্থায়ী হল। নাটকের বাহ্যিক গঠনে তো বটেই, আন্তর বস্তুতেও সে প্রভাব পরিস্ফুট। এই ধারার প্রথম সার্থক মৌলিক প্রয়াস মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটক। এই প্রতীচ্যায়ন সম্পর্কে মধুসূদন সচেতন তো ছিলেনই, এর নূতনত্ব এবং সম্ভাবনা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। তবু প্রতীচ্যের নাটক, বিশেষ করে ট্র্যাজিডি আমাদের এই নরম মাটির দেশে যে কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়ে পড়তে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিখ্যাত নট কেশব গাঙ্গুলিকে তাঁর লেখা একখানি চিঠিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে :

"We Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean drama. If you leave out the *Midsummer Night's Dream*, *Romeo & Juliet* and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic ?* Romantic in the sense in which *Sacoontala* is romantic ? In the great European drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the *Sarmista*, I often stepped out of the path of the dramatist, for that of the mere poet. I often forget the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself...I

shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouthmere poetry...As for the language, the drama to be written in. I shall follow Dr. Johnson's advice : 'If there be', says he, 'what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance.' And commends Shakespeare for having adopted this language······

"If this tragedy (অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারী) be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre." কিন্তু কৃষ্ণকুমারী বাংলা রঙ্গমঞ্চে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা পায় নি এবং যদিও এক ধরনের বিষাদান্ত নাটকের (যেমন প্রফুল্ল, শাজাহান, নূরজাহান) সৃষ্টি ও জনপ্রিয়তা প্রতীচ্য-প্রভাবের ফলেই ঘটেছে তবু 'ওথেলো' কি 'ম্যাকবেথ' শুধু যে সৃষ্টিই হয় নি তা নয়, সেগুলি মূলে কি অনুবাদে এ পর্যন্ত বাঙালীর মন হরণ করে নি মঞ্চের মাধ্যমে। যাঁরা বাংলা ট্র্যাজিডি লিখলেন তাঁরা তাঁদের আদর্শ শেক্সপীয়রকে বাঙালীর কাছে পরিবেশনে সার্থকতা অর্জন করতে পারলেন না। গত ১৯৫৪ সালে যখন বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদ স্থাপিত হয় তখন তার অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল বাংলায় শেক্সপীয়রকে জনপ্রিয় করা—অভিনয় করে, সমালোচনা করে, সটীক সংস্করণ বের করে এবং বৈঠক করে। এর আগেও অন্তত দুটি শেক্সপীয়র সমিতি বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল—একটি বাগবাজারে, তৎকালে বিখ্যাত 'ফানিম্যান' এস. সি. মুখার্জির বাড়িতে। সে বাড়ির গায়ে মর্মর-ফলকটি এখনও তার সাক্ষী। আর একটি ১৯১৯ কি ১৯২০ সালে, ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা চলে কি না জানি না তবে, প্রচারিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে কিছু উৎসাহ সঞ্চার করেছিলেন অধ্যাপক ডিমুজার এবং অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে

স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক সভাপতিত্ব করেছিলেন। বর্তমান শেক্সপীয়র পরিষদ এবং এই দুই পূর্বতন পরিষদ বাংলা মঞ্চে এখনও শেক্সপীয়রের স্থান করে দিতে পারেন নি এবং শেক্সপীয়র-আলোচনারও কোনো প্রাণবান ধারা বইয়ে দিতে পারেন নি।

শেক্সপীয়রীয় নাটক মূলে অভিনয় ক্বচিৎ কখনও বিদগ্ধদের জন্যে হতে পারে; মাঝে মাঝে ওদেশ থেকে খ্যাত-অখ্যাত নট-নটীরা এসে তাঁদের মাঝে মাঝে মুগ্ধ করে যেতে পারেন, কিন্তু সোজা প্রশ্ন হল এই যে, কেন অনুবাদে শেক্সপীয়র জনপ্রিয় হবেন না? তাঁর ট্র্যাজিডি, কমিডি কিছুই এখানে মঞ্চে স্থান পাবে না অথচ উচ্চশিক্ষা যারা নেবে তারা সবাই শেক্সপীয়রের মহত্ত্ব আপ্ত-বাক্যের মতো মেনে নেবে—এ কেমন স্বতোবিরোধ? যদি বাঙালীমন, বিজাতীয় বলে, শেক্সপীয়রীয় রসে সিক্ত না হতে পারে তাহলে শেক্সপীয়র-পাঠে সে মন এত মুগ্ধ হয় কেমন করে? আজ যদি ইবসেনের 'এ ডল্‌স্‌ হাউজ' বা 'এ্যান্‌ এনিমি অব্‌ দি পিপ্‌ল্‌' অনুবাদে এত মঞ্চ-সফল হতে পারে তাহলে আর প্রতীচ্য-প্রাচ্যের মানস-সংস্থানের পার্থক্যের দোহাই দেবার অর্থ কি? একটি যুক্তি অবশ্য দেওয়া যায়। শেক্সপীয়রের মহত্তম কাব্য অনুবাদে বিনষ্ট হয় বলে অনুবাদের পরে যা থাকে তা শেক্সপীয়রও নয়, সাধারণ সুখপাঠ্য নাটকও নয়; অতএব তিনি মঞ্চে পরিহার্য। এ কথায় সত্য কিছু আছে। শেরিডানের 'দি রাইভাল্‌স্‌' যেমন অনুবাদ্য বা বার্নার্ড শ'-এর 'মিসিজ্‌ ওয়ারেন্‌স্‌ প্রফেশন্‌', সেরকম নয় শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' বা মলিয়ের-এর লা মিসান্‌থ্রোপ বা ইবসেনের ব্র্যাণ্ড। তবু তো অনুবাদ হচ্ছে। ইস্‌কাইলাসের, সফোক্লেসের নাটক ইউরোপের তাবৎ ভাষায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদক, ভিন্ন যুগে, পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একই নাটকের অনুবাদ করেন, মূলের কাছে পৌছাবার আশায়। এই সেদিনও ফাউস্টের নতুন অনুবাদ হয়েছে ইংরেজিতে। এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা যে মূল জর্মন থেকে ফাউস্টের প্রথম খণ্ড বাংলায় অনূদিত হয়েছে গত বছর। অতএব মহৎ কাব্যের (বা নাটকের) অননুবাদ্যতা absolute বা আত্যন্তিক স্বীকার করে নিলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সবই অনুবাদ্য এবং কাজেও তাই হচ্ছে। এ যুক্তিতেও সেইজন্যে শেক্সপীয়রকে দূরে রাখা যায় না।

ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন অবশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ওথেলো

দুঃসহ ঠেকেছিল। শকুন্তলা আর টেম্পেস্টের এক তুলনামূলক আলোচনায় শকুন্তলার প্রতি তাঁর পক্ষপাত তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। দুষ্মন্তের বিস্মরণকে দুর্বাসার অভিশাপ-জাত বলে রূঢ় বাস্তবকে কালিদাস যে-ভাবে নাট্যান্বিত করেছেন সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা হল: "য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন—সংসার ঠিক যেমন নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের পরে সমস্ত দাবী কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবী নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই—পথে ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাস-খৎ তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই—কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে।···তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্যমূর্তিকে তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্যের সহিত সঙ্গত করিয়া লইয়াছেন।···শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে—একটি শান্তিসৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন।" এখানে জীবন-সত্য ও কাব্য-সত্য নিয়ে যে বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ অবিসংবাদিত সত্য বলে মেনে নিচ্ছেন তার বিচারে না গিয়েও আমরা, যে উদ্ধৃতিটি আগে দিয়েছি তার একটু পরেই, 'টেম্পেস্ট' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে চূড়ান্ত মতামত ঐ প্রবন্ধেই পাচ্ছি, তার থেকে মনে করা অসমীচীন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের সৃষ্টিকে এবং প্রতীচ্যের তাবৎ মহৎ সাহিত্যকে, প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের তুলনায়, হীনমূল্য বলে করতেন এবং প্রতীচ্যের সাহিত্যে বাস্তবের রূঢ় অবলেপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইউরোপের কবিদের সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ এই যে তাঁরা "সাংসারিক সত্যের নকল" করেন। কিন্তু বাস্তবের নকল যে সাহিত্য নয় এ-কথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি কারও জানবার কথা নয়। এবং শেক্সপীয়র যদি তাই করে থাকেন তাহলে তিনি সাহিত্যিকই নন। এই কথাপ্রসঙ্গেই 'টেম্পেস্ট' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল:

"টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টে মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার

প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে,—শকুন্তলার সরলতা অপমানে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ব, গম্ভীর স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি—শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।"

এর থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না কেন রবীন্দ্রনাথ ওথেলো সহ্য করতে পারেন নি এবং রবীন্দ্রনাথের এই মানস-সংস্থান যদি ভারতীয় অতএব বাঙালীর মানসপ্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে সত্যিই মধুসূদনের কথা না মেনে উপায় থাকে না: "With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairylands." এই world of reality-কে দেখার ধরনে প্রতীচ্য আর প্রাচ্যের, ইংরেজ আর বাঙালীর এই পার্থক্যের ফলেই কি বাঙালী জনসাধারণ মনের গভীরে শেক্সপীয়রকে গ্রহণ করতে পারে নি, শুধু ক্লাসরুমে আর বক্তৃতামঞ্চে তাঁকে "মাথায় রেখেছে?" কিন্তু তাই বা বলি কেমন করে। মধুসূদনও যে মনেপ্রাণে বাঙালী ছিলেন এবং যিনি বলেছিলেন "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'" সেই বঙ্কিমও, এই বাংলাদেশে, মধুসূদনের পরে, শেক্সপীয়রের সৃষ্টিতে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, হয়তো অজ্ঞাতেই, কপালকুণ্ডলার রূপকল্পনায় টেম্পেস্ট এবং ওথেলোর দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রভাব শুধু উপরিতলের দু-একটা theme বা situation বা stage-trick-এর নয়। সে হিসেবে তো রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' এবং 'শেষ রক্ষা' প্রত্যক্ষভাবে শেক্সপীয়র-প্রভাবিত। কপালকুণ্ডলার ওপর টেম্পেস্ট-এর এবং ওথেলোর প্রভাব একেবারে মূলগামী এবং বঙ্কিমের মন সে প্রভাবের একান্ত প্রত্যাশী। শকুন্তলা এবং টেম্পেস্ট সম্পর্কে এবং শকুন্তলা ও মিরান্দা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও তাই রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত:

'উভয়েই ঋষিকন্যা।...উভয়েই ঋষি-পালিতা।...উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ।—কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা।...মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা

হইবে?...সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই।...অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য অধিক।...মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।...দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, একপ্রকার লুকোচুরি খেলা।...মিরন্দার সে সকল নাই।...মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখি—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে...

I would not wish
Any companion in the world but you;...

পুনশ্চ

Hence, bashful cunning!
And prompt me, plain and holy innocence!
I am your wife, if you will marry me;...

...উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়-সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালোবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর", মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ এই "টল টল চঞ্চল বীচিমালা"-র অশান্তি সইতে পারেন না। বঙ্কিম-মানস, রেনেসাঁস-ভাব-পরিমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত বলে, শুধু জীবনমুখীই নয়, ইহকালকেই শুধু মুখ্য মূল্য দেয় না, জীবনের কুৎসিত-সুন্দরে, ক্লেদে-অমৃতে, দেবত্বে-পশুত্বে সমান কৌতূহলী। জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিলাসই সে

মনের কাম্য। সে মন প্রস্‌পেরোর নিরাসক্ত জীবন-প্রীতি থেকে ম্যাকবেথের পৈশাচিকতা পর্যন্ত—জীবনের সমগ্র বিস্তারকে গ্রাস করতে চায়, কিছু রেখে-ঢেকে চলতে সে নারাজ। প্রস্‌পেরো যে বৈরাগ্যে বলেন :

"......I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'll drown my book"

তাও এই রেনেসাঁস-মন যেমন স্বীকার করে তেমনি স্বীকার করে Sir Toby-র কথা : "Dost Thou think because thou art virtuous, there shall be no cakes and ale ?" আবার তেমনি সে মনের সহানুভূতি Isabella-র সঙ্গে যখন সে মানুষের আত্মম্ভরিতায় আর আত্মাদরে মানুষের ওপরেই আস্থা হারিয়ে ফেলে :

...But man, proud man,
Dressed in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assured,
His glassy essence, like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep.

এই হল জীবনের "টল টল চঞ্চল বীচিমালা।" রবীন্দ্রনাথ "cakes and ale"-কে বাদ দিয়ে জীবনকে দেখতে চান এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিই যদি খাঁটি ভারতীয় তাহলে বঙ্কিম কোথায় থাকেন আর বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল এবং বিষবৃক্ষ-ই বা কোথায় থাকে? বঙ্কিমেরও মনে সনাতনী ছিল কিন্তু সে সনাতনী চাইত ঐহিক জীবনের কল্যাণ; তাই বঙ্কিমের দেবতা কুরুক্ষেত্রের নায়ক কৃষ্ণ; বৈষ্ণবের ভাবৈকসর্বস্ব রসময় নন। শেক্সপীয়রের অকুণ্ঠ মর্ত-প্রীতি এবং জীবনকামনা তাই বঙ্কিমকে এত নাড়া দিয়েছিল, দিয়েছিল মধুসূদনকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নয়। সেইজন্যে ঐ প্রবন্ধেরই শেষে বঙ্কিম যখন বলেন, "ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্য-হৃদয়ই থাকে" তখন সে কথা মানতে দ্বিধা লাগে। রবীন্দ্রনাথ কি কখনও ওথেলো সম্পর্কে বঙ্কিমের এই বিচার গ্রহণ করবেন?—

"শেক্সপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ শেক্সপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত বিলোল কোলাহল, উর্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্য-সংসারে দুর্লভ।" অর্থাৎ কালিদাসে বাছাবাছি, বর্জন-নির্বাচন আর শেক্সপীয়রে সমগ্রতা।

এই সমগ্রতাকে গ্রহণ করতে কি বাঙালী পরাঙ্মুখ? সমাজ-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় এখনও অসাধ্য ব্যাপার। সামাজিক জীবনে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই যে সাহিত্যও স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে তার যেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই তেমনি সমাজ-জীবন দুর্বহ বা অধোগামী হলেই যে সাহিত্যেরও অধোগতি ঘটবে তারও কোনো স্থিরতা নেই। দান্তে ডিভাইন কমিডি লেখেন নির্বাসনে বসে আর টলস্টয় তাঁর মহৎ উপন্যাসরাজি রচনা করেছিলেন জারিস্ট রাশ্যায়। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাম্যবাদী রাশ্যায় তাঁর ধারে-কাছে যেতে পারে এমন সাহিত্যিকের জন্ম হল না। গোর্কির কথা আলাদা, তাঁর সাহিত্যজীবনের আরম্ভ প্রাগ্‌বিপ্লব যুগে। আবার ভিক্টোরীয় যুগে ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য সর্বোচ্চ সীমায় পৌছালেও দ্বিতীয় শেক্সপীয়রের জন্ম হয় নি। অবশ্য উপন্যাসে ডিকেন্স ছিলেন। আমাদের দেশও স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সাহিত্যে কি সমাজ-জীবনের বহু-বিজ্ঞাপিত সাংগঠনিক জোয়ার প্রতিফলিত হচ্ছে? সমাজজীবনের পরিবর্তমান রূপের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কারণ বাস্তব-জীবনই সাহিত্যের উৎস, কিন্তু কোন সামাজিক পরিবেশে সাহিত্য কেমন রূপ নেবে, তার বিকাশ ব্যাহত হবে না পুষ্ট হবে, তা নিরূপণ করা এখনও অসাধ্য হয়েই রয়েছে। তাই বাঙালীর বাস্তব জীবনে, সেই উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সময় থেকে এমনকি স্বতোবিরোধ জন্মাল যার ফলে বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথের পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটল পৃথিবীর মহত্তম নাট্যকার সম্পর্কে এবং সমাজ-জীবনের কি অন্তর্বাহিনী ধারার, জাতীয় জীবনের কি বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তনায় বাঙালী

'প্রফুল্ল' নিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিল কিন্তু বঙ্কিমোত্তর যুগে ওথেলোকে সহ্য করতে পারল না ; শেক্সপীয়রকে ওপরে ওপরে অনুকরণ করল কিন্তু তাঁর নাটকের আস্বাদনে বিমুখ হয়ে রইল ? আর এ বিমুখতা কি শুধু বাঙালীর আর ভারতীয়ের ? না চীনে, জাপানেও আছে ? লাফকার্ডিও হার্ন তো বলেছিলেন তাঁরা শেক্সপীয়রকে গ্রহণ করতে পারেন নি। চীনের অভ্যন্তরে, প্রতীচ্য-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশই ঘটে নি। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব কি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর রুচিবৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে এই বিমুখতার ব্যাখ্যা করবে ? সেও তো একটি অনিশ্চিত প্রকল্প মাত্র। এবং তারও প্রচুর ব্যতিক্রম। অনেকে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির সাহায্যে বাঙালী চরিত্রের একটি রূপরেখা আঁকবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঐ অবরোহ বা deductive পদ্ধতিতে না গিয়ে আরোহ বা inductive পদ্ধতিতে বিচার করলে, অর্থাৎ বর্তমানের বাঙালীর সবচেয়ে রুচি-সম্মত একখানি নাটকের বিশ্লেষণ করে, দেখা যেতে পারে, কি কি উপাদান তাতে আছে এবং কি প্রকারের ঔপাদানিক মিশ্রণ বাঙালীর মনোহরণ করেছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের কথাই বলছি। এই নাটকের মূল motif হল Othello নাটকে Cassio-র সেই উক্তি : "O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee devil !" নাটকের মূল চরিত্র যে villain রমেশ সে Iago-র ভিত্তির ওপরেই কল্পিত, তবে শেক্সপীয়রের অন্যান্য villain-র ছাপও পড়েছে। লেডি-ম্যাকবেথের somnambulism অনুকৃত হয়েছে উমাসুন্দরীর ক্ষেত্রে। নাটকের মূল ঘটনাটি আকস্মিক—ব্যাঙ্ক ফেল। যোগেশ মহাদাশয় ব্যবসায়ী ; ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার ফলে তাঁর মনে যে আঘাত লাগে তারি সুযোগে, তাঁর মদের প্রতি দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে রমেশ তাঁর সব সম্পত্তি হাত করে, সেই সম্পত্তি রক্ষার সব ব্যবস্থা পাকা করবার চেষ্টায় যোগেশের একমাত্র পুত্র যাদবকে খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু তার আগেই সে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে এবং অন্যান্যের মৃত্যুর কারণও হয়েছে ! সে unmitigated villain.

এই নাটকে যোগেশ প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত শুধু খেদোক্তি করছেন এবং মদের ঝোঁকে সব ভুলে থাকতে চাচ্ছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" চতুর্থ অঙ্কের শেষে না এসে প্রথম দৃশ্যের শেষেই আসতে পারত।

ট্র্যাজিডি দেখে যে আমরা অপূর্ব চিত্তপ্রসার ও গৌরব বোধ করি (শুধু সুখ বা আনন্দ নয়) তার মূল কারণ হল এই যে ট্র্যাজিডি আমাদের কাছে মানবাত্মার আত্যন্তিক মূল্য প্রকট করে—যে মানবাত্মা শত ভাগ্যবিপর্যয়ে, নিপীড়নে আপন dignity বা আভিজাত্য বিসর্জন দেয় না—সব সহ্য করে কিন্তু হারে না। ওথেলো যখন বুঝল তার মর্মান্তিক ভুল তখন সে আত্মহত্যা করল। যাকে বিনাশ করেছে তার বিনাশের পরেও বাঁচা মানে সেই অমূল্য সম্পদের অমূল্যতাকেই অস্বীকার করা। এইখানেই মানুষের গৌরব। এ-কথা জগতের যে কোনো মহৎ ট্র্যাজিডি সম্পর্কে সত্যি। Antigone মৃত্যুবরণ করেছিল শুধু ভাই-এর প্রতি স্নেহবশে নয়, যে রাষ্ট্র বা রাজা মানুষের অপমান করে তার বিরুদ্ধতা করে। এইজন্যেই সে গৌরবান্বিতা। যোগেশে এই human dignity-র একান্ত অভাব। সে বিরুদ্ধ শক্তির কাছে একেবারে পরাজয় স্বীকার করেছে। সে মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে কেবল কেঁদেছে—কেবল আমাদের করুণা ভিক্ষা করেছে। Sentimentality হল দুর্বলতা ; কোনো চরিত্রের এইটিই যদি বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে সে চরিত্র tragic আয়তন লাভ করতে পারে না তবে দুঃখবিলাসী সাধারণ মানুষকে কাঁদাতে পারে—সেই কান্নায় কিছু relief আছে। বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি যাতেই একটু নাড়া খায়—সে হাসিতেই হোক আর কান্নাতেই হোক—তাই বেশ লাগে—শুকতুনি-খাওয়া মুখে কালেভদ্রে একদিন মাংসের উগ্র ঝালে নাক দিয়ে জল পড়ার মতো। আসল কথা যোগেশের চরিত্রে ট্র্যাজিডির নায়ক হবার মতো আত্মিক শক্তি নেই। সে নিবীর্য। কারও যদি মনে হয় সহ্য করার শক্তিতেই বীর্যের প্রকাশ তাহলে সে-কথা অবশ্য-স্বীকার্য। সহ্যের সেই অপরিসীম শক্তির বিকাশ আছে Œdipus the King-এ, Œdipus at Coloneus-এ, এমনকি Synge-এর একাঙ্ক নাটক *Riders To The Sea*-তে। কিন্তু যোগেশ তো সহ্য করছে না—সে ভারসাম্য হারিয়ে অমানুষ হয়ে গিয়েছে—আপন পূর্ব-ব্যক্তিত্বের এতটুকু তার অবশিষ্ট নেই এবং তার কোনো পরিচয়ও নাট্যকার আমাদের দেন নি। এ-ক্ষেত্রে তাই সে কথাও ওঠে না। ফলে এ-চরিত্র আমাদের মনে কোনো শ্রদ্ধা, কোনো বিস্ময় জাগাতে অক্ষম। Galsworthy-র নাটক Justice-এর নায়ক একজন সাধারণ কেরাণী শুধু তার একটু চরিত্র-চ্যুতি, সেই tragic error, সেটি যে নৈতিক চ্যুতি নয় তাই প্রমাণ করবার জন্যে এবং নায়কের দুঃখ সইবার শক্তিকে দর্শকের কাছে

উদ্ঘাটিত করবার জন্যে Galsworthy-র কি প্রস্তুতি। গিরিশচন্দ্র এ সব দিকে মনই দেন নি। এবং catastrophe-টি প্রথম দৃশ্যেই ঘটিয়ে দিয়ে আর নায়ককে মদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিরিশচন্দ্র villain-এর ফন্দি, কেতরাজি এবং নানারকম আইনের মারপ্যাচ দেখাতে ব্যস্ত। শেষে শিশুহত্যার মর্মন্তুদ দৃশ্য অবতারণা করে তিনি আরও চোখের জল দাবী করছেন এবং প্রফুল্লের গলা টিপিয়ে তিনি villain-এর চুড়ান্ত পৈশাচিকতা প্রদর্শন করছেন। তাতে দর্শক কিছু বীভৎস রসের আস্বাদন পাচ্ছে। কিন্তু যোগেশের ট্র্যাজিডিতে এর কি প্রয়োজন ছিল? সে ত স্ত্রীকে পথে মরতে দেখে মদের সন্ধানে গিয়েছে এবং ছেলের হাত মুচড়ে চারটি পয়সা কেড়ে নিয়েছে। তবে আর কেন? নাটক রচনায় কোনো economy বা পরিমাণবোধ গিরিশের নেই। অন্য পক্ষে নায়কের যে বৈশিষ্ট্য দর্শকচিত্তকে শুধু উদ্বেলিতই করে না, মানব মনের গভীরতর স্তর-স্তরান্তরকে অবারিত করে মানুষের চরিত্রের দুর্লক্ষ্য, দুর্জ্ঞেয় মূলের রহস্যময়তার দিকে ইঙ্গিত করে, আবার নায়কের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও জটিলতাও প্রকাশ করে সেই inner conflict বা অন্তর্দ্বন্দ্ব যোগেশে একান্ত অনুপস্থিত। ফলে নাট্যরস জোলো হয়ে গেল। আর ভজহরির আকস্মিক দয়ায় যাদব রক্ষা পাওয়ায় দর্শক চোখের জল মুছে 'ভগবান, তুমি আছ' বলতে বলতে বাড়ি গেল। এ-রকমটা ঘটতে দেখেছি England-এ অষ্টাদশ শতকের domestic tragedy-তে। সেটা ছিল sentimental নাটকের যুগ—ঐ নামেই তা চিহ্নিত। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ও সেখানে দেখা গিয়েছে ঐ যুগেই। মধ্যবিত্তের নীতিবোধের সঙ্গে এই নাটকের উদ্ভবকে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে।

কিন্তু 'প্রফুল্ল'—অর্থাৎ ঐ poetic justice নির্ভর, sentimental, মধ্যবিত্তের দুর্বলতা-সর্বস্ব নাটকখানি যদি বাংলায় আদর্শ ট্র্যাজিডি হয় এবং বাঙালী মঞ্চ-পৃষ্ঠপোষকদের প্রিয়তম নাটক হয় তাহলে শেক্সপীয়রের সে মঞ্চে অবতারণ করা বিপদ। খাস ইংলণ্ডেও, নিজের জীবদ্দশাতেই শেক্সপীয়র দেখেছিলেন, লোকে ওথেলো আর তেমন পছন্দ করছে না, চাইছে Beaumont and Fletcher-এর *The Maid's Tragedy* এবং Welster-এর স্থূল, বিকৃত, ত্রাস-সর্বস্ব *The Duches of Malfi* বা কিছু পর Ford-এর *It's Pity She is a Whore.* কিন্তু এঁরা রেনেসাঁস নাটকের decadence বা অবক্ষয় সৃষ্টি করছেন। আর বাংলাদেশে নাটকের উঠতি কালেই এই দশা। শেক্সপীয়রের

সার্থক আলোচনা বাংলায় হবে কেমন করে। তবু এক ইংরেজ অধ্যাপকের (Humphry House) এক ইংরেজি প্রবন্ধে (যার স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ পরিচয়-এ বেরিয়েছিল) বাঙালী মেয়ের (এবং মা কালীর) শেক্সপীয়রীয় স্বীকৃতি প্রমাণিত দেখে 'বিষাদে হরিষ' ঘটে। শেক্সপীয়ারের সনেটে সেই বিখ্যাত 'Dark Lady' না কি বাঙালী শ্যামাঙ্গী।

বাংলা মঞ্চে শেক্সপীয়র বর্জিত—সে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল নন), দানী বাবু, গিরিশ ঘোষ প্রমুখের চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু শেক্সপীয়র বাঙলাদেশে, সেই ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ির মঞ্চে, *Julius Caeser*-এর দৃশ্যাবলী দেখানোর সময় থেকে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছেন শুধু শখের নাট্যগোষ্ঠীদের চেষ্টায়। এঁদের চেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে কোনো সজীব সমালোচনার বিচিত্র ধারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে নি ঠিক, কিন্তু কৌতূহলী মহল মাঝে মাঝে, মূলে হোক, অনুবাদে হোক, শেক্সপীয়রকে পেয়েছেন। এই শখের গোষ্ঠীগুলি অবশ্য শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠান এবং এঁরা যে রুচির অনুশীলন করেন তা সাধারণ থিয়েটার দর্শকের রুচির চেয়ে অনেক উন্নত। তাহলে কি শেক্সপীয়রপ্রীতি নির্ভর করে রুচির মান উন্নয়নের ওপর? না কি প্রতীচ্য শিক্ষার প্রসারের ওপর? তাহলে তাঁর বা যে-কোনো মহৎ সৃষ্টির সর্বজনীনতার তত্ত্বটি নতুন করে ভাবা দরকার।

উনিশ শতকের চোখে শেক্সপীয়র

শেক্সপীয়রের নাটকে হত্যা রসভঙ্গদোষ দুষ্ট

বর্বরস্বভাব এবং রক্তপ্রিয় অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণ গ্রীক ট্রাজিডিকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তাই ইংরাজি সাহিত্যেও এই ট্র্যাজেডি অনায়াসে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেক্সপীয়রের অতুল্য প্রতিভা ট্র্যাজেডির আনন্দে মাতিয়াছিল। তাঁহার রুচি এমন পরিশুদ্ধ হয় নাই যে, সেই ট্র্যাজেডির দোষ দর্শন করিয়া তাহা পরিবর্জন করে। তিনি তাঁহার সমস্ত গুণপনা ও কবিত্বশক্তি সেই ট্র্যাজেডির মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি সুতরাং জগতের এক অতুল্য পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে সেক্সপীয়ারের প্রতিভাসম্পন্ন কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষপান করিয়াছে। আজি আমরাও সেক্সপীয়ারের পাঠক, পাঠক কি! তাঁহাকে পূজা করিতেছি।

...প্রাচীন আর্যসাহিত্যে যদিও ইউরোপীয় বিয়োগান্ত রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত রীতির যাহা প্রধান গুণ তাহা আর্যসাহিত্যে ছিল। যে করুন রস বিয়োগান্ত রীতির প্রধান গুণ তাহা আর্যসাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সেক্সপীয়ারের ডেসডিমোনার জন্য যেরূপ সন্তপ্ত হই, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা প্রভৃতি কবিকল্পিত নায়িকার জন্য কি তদপেক্ষা অনধিক পরিমাণে সন্তপ্ত হইয়া থাকি? অথচ তাঁহারা কেহই ডেসডিমোনার ন্যায় নৃশংসরূপে নিহত হন নাই। বাল্মিকী মহাকবির ন্যায় কেমন কাল্পনিক সুন্দর দৃশ্যে সীতাকে আপন কার্য হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সরলা; নিষ্পাপিনী ডেসডিমোনা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইলেন; সীতা কবি-কল্পিত স্বারিথে দেবতাগণের পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দধ্বনি সহকারে স্বর্গারোহন করিলেন।...

ভবভূতি বা বাল্মীকির সহিত এখানে সেক্সপীয়ারের তুলনা হইতেছে না। আমরা জানি, সেক্সপীয়ারের অনেক গুণ আছে, সে জন্য তিনি চিরস্মরণীয়

হইবার যোগ্যপাত্র। তিনিও একজন মহাকবি। কিন্তু এখানে tragic রসের বিচার হইতেছে; সন্তাপের স্থায়ী ফলের কথা হইতেছে। এ প্রস্তাব কবিত্বের বিচার নহে। তাহা স্বতন্ত্র কথা। সীতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, দময়ন্তী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। চিরদুঃখিনী হইয়া তাঁহারা জগজ্জনের হৃদয়মন্দির চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া আছেন। নিহত না হইয়াও তাঁহাদের বিয়োগ জগতের নিকট চিরসন্তাপের কারণ হইয়াছে। সকলেই তাঁহাদের জন্য কাতর। তবে ত হত্যা ব্যতীতও সন্তাপ সমান স্থায়ী হইতে পারে।

সে যাহা হউক, অনেকে হয় তো বলিবেন, ডেসডিমোনার জন্য কি আমাদের হৃদয় কাঁদে না? হৃদয় কাঁদে বটে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড দ্বারা নিহত হইলে যে অশ্রুপাত হয়, তাহার সহিত সীতার মত বিয়োগহেতু অশ্রুপাতের একটু স্বতন্ত্রতা আছে।

সেক্সপীয়ারে আমরা আইমজিন এবং ডেসডিমোনার মত পতিপরায়ণতা ও প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাই। ডেসডিমোনার প্রেম জুলিয়েটের মত 'বুকচাপড়ানি' প্রেম নহে। তাহা অতি গভীর, অতি শান্ত ও হৃদয়ব্যাপী, অথচ তেমনই উগ্র, উষ্ণ ও প্রবল। সে প্রেম চক্ষের নেশা নহে। সেই প্রেমভূষিতা ডেসডিমোনা সর্বজনমনোহরা, তাঁহার হৃদয়মাধুরীতে তিনি সকলের মন হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চিত্র আঁকিয়াই সেক্সপীয়ার মূরের চরিত্র ফুটাইতে ফুটাইতে ডেসডিমোনার খুনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তারপর পাঠক ডেসডিমোনার খুনের নিমিত্ত ষড়যন্ত্রে ও ঘোর হত্যাব্যাপারে নিমগ্ন হইলেন। ডেসডিমোনা নির্দয়রূপে নিহত হইলেন। ডেসডিমোনার সৃষ্টি কি কেবল এইরূপ ঘোর হত্যা-ব্যাপারের নিমিত্ত? তাহার হত্যা-ব্যাপার দেখিয়া কি অশ্রুপাত হয়? না শরীর শিহরিয়া ওঠে? ডেসডিমোনার পর এমেলিয়া নিহত হইল। মনে হয়, সেই ছুরিকাঘাতে যেন নিজ বক্ষ বিঁধিল। কি ভয়ানক!

ম্যাকবেথ আরও ঘৃণিত ব্যাপার। ম্যাকবেথের সর্বত্র হত্যা;—তাহার গোড়ায় হত্যা, তাহার মধ্যে হত্যা, তাহার শেষে হত্যা। নাটকের প্রায় সমুদায়ই কসাইখানা; মধ্যে যখন লেডি ম্যাকবেথ উদয় হইয়া বলিতেছেন, আমার রক্তহস্ত যে কিছুতেই ক্ষলিত হইতেছে না, তখন যেন সেই কসাইখানা আরও দেদীপ্যমান হইতে থাকে। তাঁহার সামান্য অনুতাপের চিত্র সেই

রক্ত-গঙ্গাকে আরও উজ্জলরূপে দেখাইয়া দেয়। প্রকাণ্ড গৃহদাহে দু ফোঁটা জলের মত সেই অনুতাপ অগ্নি-শিখাকে আরও যেন প্রজ্জলিত করিয়া দেয়। সে অনুতাপ বিষকুম্ভে ক্ষীর মাত্র। হত্যা, নাটকের সর্বত্র; অনুতাপ একস্থানে মাত্র। সে অনুতাপচিত্র রক্ত-গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা ঘোর হত্যাপূর্ণ নাটকের প্রলোভনস্বরূপ।

সেক্সপীয়রের সমস্ত বড় বড় নাটকে এই বীভৎস ব্যাপার। হামলেটের শেষ অঙ্কও কসাইখানা। রিচার্ড দি সেকেণ্ড এবং থার্ড, জন, লিয়ার কোরাইওলেনাস প্রভৃতি সকল নাটকই হত্যাকাণ্ডে পরিপূর্ণ। জুলিয়স সিজরে কি ভয়ানক রবে এই কথাগুলি প্রতিশব্দিত হয়—Beware the ides of March! সিজরের হত্যার পর এই শব্দগুলি মনে হইলেই হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে! কোথায় নাটকীয় করুণ রস! আজিও আমরা ম্যাকবেথের নাম করিলে শিহরিয়া উঠি, রিচার্ড দি থার্ডের ঘৃণিত ব্যাপার হইতে শত হস্ত দূরে যাই! নাটক পড়া দূরে থাক, মনে হয় Tragedy আর পড়িব না।

সেক্সপীয়ার কি শুদ্ধ তাঁহার ট্র্যাজেডিতেই শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়াছেন? লিখিতেছেন Comedy, সেখানেও সেই ছুরিকা। Merchant of Venice পাঠ কর, সেখানেও তোমার চক্ষু সমক্ষে সেই ছুরিকা শাণিত হইতেছে। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ এবং অতি ঘৃণিত ব্যাপার।...নাটক নবরসের আশ্রয়ভূমি। Tragedy করুণ ও ভয়ানক রসের আশ্রয়। হত্যা বা খুন কখন ভয়ানকের চরম সীমা নহে। রসের পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে তাহাকে আনন্দজনক করা চাই। যাহা আনন্দজনক না হয় তাহা রসের পরিচায়ক নহে। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করাতে রসের পরিপাক হয় না; তাহা কবিত্বের হানিজনক এবং রসভঙ্গদোষে দুষ্ট হয়। Butchery is not poetry.

আমরা একথা বলাতে, সেক্সপীয়ারের সকল ট্র্যাজেডিতেই যে একেবারেই কবিত্ব নাই, এমন কথা বলিতে চাই না। আমরা সাহিত্যে শুদ্ধ খুনেরই নিন্দা করিতেছি। খুন না করিলে কি করুণ রসের পরিপুষ্টিসাধন করা যায় না? যিনি না করেন, তিনি বিভাবাদি দ্বারা রসের পরিপাকসাধনে নিতান্ত অসমর্থ। খুনের প্রতি মানুষের স্বভাবতই ঘৃণা। খুনের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য নাট্যসাহিত্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। প্রকৃত

প্রস্তাবে ওথেলোর ন্যায় কয়জন লোক দেখা যায়? বাস্তবিক সেক্সপীয়ার ওথেলোকে যেরূপ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ওথেলোও যেন কিয়ৎ পরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। লোক ততদূর নির্বোধ হয় কি না সন্দেহ,—বিশেষতঃ ওথেলোর মত একজন বীর সেনাপতি। সেক্সপীয়ারের কিং জনে যে স্থলে হিউবার্ট উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা আর্থারের চক্ষু উৎপাটন করিতে আসিয়াছে এবং সেই কার্যের উদ্যোগ হইতেছে, সে স্থলের অভিনয় কতই না ঘৃণার উৎপাদন করে। রক্ষা এই শেষে সে কার্য ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু দেখা গেল নৃশংস জনের পীড়নের জ্বালায় সেই রাজপুত্র কারাবাসের উচ্চপ্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া মরিল। তাহার আত্মহত্যা কাহার না হৃদয়ে অনর্থক বেদনার উৎপাদন করে? এরূপ বীভৎস চিত্রের ফল কি? রাজ্যলোভের ঘৃণিত পাপ-চিত্রে দেখাইবার জন্য কি এই চিত্রের অবতারণা? কয়জন রাজাই বা সেরূপ ঘৃণিত হইতে পারেন? তবে সে চিত্র সাধারণ লোকের সম্মুখে কেন? নাটক কিছু ইতিহাস নহে। ইতিহাসের সম্পত্তি ইতিহাসে রাখিয়া দিলেই ভাল ছিল। সেক্সপীয়ার যেখানে butchery না করিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছেন, আমরা সে রচনার যারপরনাই প্রশংসা করিয়া থাকি। তাঁহার অনেক tragi-comedy এই ধাতুতে গঠিত। সেরূপ রচনাকে আমি ট্র্যাজেডি শ্রেণীভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত নহি। আইমজিন তত কষ্ট সহ্য করেন নাই যে, তিনি চিরদুঃখিনী দময়ন্তী বা সীতার মত জগতের সন্তাপভাজন হইতে পারেন। সিম্বেলিন বিয়োগান্ত হইলে যদি আইমজিনের সহিত লিয়নিটসনের মিলন না ঘটিত, তাহা হইলে আইমজিনেতে লোক অধিকতর কাতর হইত। বিয়োগে কাতরতা উৎপাদন করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডে বীভৎস রসের সঞ্চার হইয়া রসভঙ্গ ঘটে। ডেসডিমোনাকে মনে হইলেই তাঁহার খুন মনে হয়, অমনি হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। সুতরাং রসভঙ্গ ঘটে।

পূর্ণচন্দ্র বসু। সাহিত্যে খুন। সাহিত্য, ১৩০২।

নাটকের নায়ক বিরাটচারী

আমার বিশ্বাস যে নায়ক সর্বগুণান্বিত হওয়া চাই, এই যে নিয়ম, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, নাটকের বিষয় মহৎ হওয়া চাই। এই জন্য প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেরই নায়ক রাজা, বা রাজপুত্র। Shakespeare-এর সর্বোৎকৃষ্ট

নাটকগুলির নায়ক হয় সম্রাট, নয় রাজা, বা রাজপুত্র ; (Macbeth পরে রাজা হইয়াছিলেন, এবং Othello একজন General)।

…নায়ক সর্বগুণসম্পন্ন বা দোষবিরহিত হইবেন, ইহা একটু বেশি রকমের বাঁধাবাধি নিশ্চয়। তাহাতে দোষশূন্য মানুষকে নায়ক করিলে অপ্রাকৃত নায়ক হয়।…

মহাকবি Shakespeare এ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের বিষয় মহৎ বটে, কিন্তু তাঁহার নায়কগণের বিশেষ কোনও গুণ নাই। Hamletএর গুণের মধ্যে পিতৃভক্তি। কিন্তু তিনি সমস্ত নাটকখানিতে কেবল ইতঃস্তত করিয়াছেন। King Lear ত উন্মাদ। সন্তানের পিতৃভক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি জানেন কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাস। তাহার পরে তাঁহার প্রধান দুঃখ Regan ও Gonerill তাঁহার পার্শ্বচর কাড়িয়া লইয়াছেন। পিতৃভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার আক্ষেপ উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। Othello ঈর্ষাপরবশ হইয়া এতদূর অন্ধ হইলেন যে, প্রমাণ না চাহিয়াই সাধ্বী স্ত্রীকে বধ করিলেন। Macbeth তো নিমকহারাম। Antony কামুক। Julius Caesar দাম্ভিক। কিন্তু Shakespeare এই নাটকগুলিতে সেইসব চরিত্রদৌর্বল্যের বা পাপ-প্রবৃত্তির ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। সব ক্ষেত্রেই পাপের নিষ্ফলতা বা আত্মহত্যা দেখাইয়াছেন। Goethe-র Faust-এও তাই।

কিন্তু Shakespeare এই গ্রন্থগুলিতে এত উচ্চ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার নায়কদিগের চারিদিকে তাহারা একটি জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সেই নাটকগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। Hamlet-এ Horatio, Polonius, Ophelia ; Lear-এ Kent, Fool, Cordelia ; Othello-তে বিশুদ্ধচরিত্রা Desdemona ও তাঁহার সহচরী ; Macbeth-এ Banquo ও Macduff ; Antony and Cleopatra-তে Octavious ; Julius Caesar-এ Brutus ও Portia নায়কদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তথাপি Shakespeare কেন এরূপ করিলেন ? তাহার কারণ বিবেচনা করি এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গর্বিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাঁহার কাছে সমধিক লোভনীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমধিক মুগ্ধ হইতেন। বিরাট ক্ষমতা, বিরাট বুদ্ধি, বিরাট বিদ্বেষ, বিরাট

অসূয়া, বিরাট প্রতিহিংসা, বিরাট লোভ তাঁহার কাছে সমধিক লোভনীয় ছিল। নিরীহ শিশু, পরদুঃখকাতর বুদ্ধ বা ভক্ত চৈতন্য বোধহয় তাঁহার মতে অতি ক্ষুদ্র চরিত্র। স্বার্থত্যাগের মহত্ব তিনি যে একেবারে বুঝিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্যকে তিনি ক্ষমতা ও বাহিরের জাঁকজমকের নীচে স্থান দিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কালিদাস ও ভবভূতি। ১৩২২

শেক্সপীয়রের নাটকে প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্য

শেক্সপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্সপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই। এবং তাঁহার নাটকে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপর প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা কেবল ছায়ার মত চতুর্দ্দিকের মানব-হৃদয়ে ও ঘটনার উপরে ঘনাইয়া আসে মাত্র ; কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহমর্মিনী সঙ্গিনী হইয়া উঠে নাই, এবং মানবী সখীর সুখে দুঃখে মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।

যেখানে সমগ্র নাটকটিকে শেক্সপীয়র লোকালয় হইতে বহু দূরে এক জনহীন দ্বীপে লইয়া ফেলিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার পারিবারিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই—প্রকৃতির অনেকগুলি দানবী শক্তি যেখানে নির্বিবাদে আধিপত্য করিতেছিল, সেইখানে তিনি এক মহামহিম মানব প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানব প্রভু প্রস্পেরোকে বন্য শক্তি আরিয়েল ও ক্যালিবান যমের মত ভয় করিয়া চলে এবং যদি কালক্রমে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়, এই আশায় দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্পেরো অথবা মিরান্দার সহিত এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাহারও কোনরূপ সমকক্ষতা নাই এবং বহুদিন একত্র বাসে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও জন্মে নাই। কেবল প্রস্পেরো আদেশ করেন, আরিয়েল ও ক্যালিবান—প্রকৃতির দুই বিভিন্ন শক্তি—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই আদেশ পালন করে। প্রস্পেরো বলেন ঝড় উঠাও ; প্রকৃতির সমস্ত শক্তি সাগরে তরঙ্গ তুলে, আকাশে বজ্রধ্বনি করে, পৃথিবীতে প্রলয়ের

রোল উঠাইয়া দেয়। প্রস্পেরো বলেন, এই চাহি—দাসেরা তাহাই সংসাধন করে। শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে—প্রকৃতির উপর সে কর্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।…

শেক্ষপীয়রে প্রেমের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। সেখানে সুখসুপ্ত চন্দ্রালোকে প্রণয়িযুগলের মনে পূর্ব পূর্ব কালের বহু প্রণয়কাহিনী আসিয়া উদয় হয় এবং পুরাতন কালের সমস্ত প্রেম এই নবীন প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এবং এইরূপে যুগযুগান্তের মানবপ্রেম আসিয়া মানবকে আপনার মহিমায় অধিকতর ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না, হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যান্ট অফ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয় ঘটনায়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্র ও কাব্য। ১৮৯৪

শেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্র চিত্ররূপময়

সেক্ষপীয়রের পাপের ছবিই সর্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসে শ্মশান-বর্ণনা পাই না, নরকবর্ণনা পাই না, ম্যাকবেথ পাই না, ইয়াগোও পাই না। কিন্তু সেক্ষপীয়রের অদ্ভুত পাপসৃষ্টি ক্যালিবনের প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না।…

…যেখানে দশপনরটি পরস্পরবিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবসবল হইবার কথা, সেখানে সেক্ষপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জয় দুরাকাঙ্খা রাশি রাশি পাপকার্যে রত হইতে বলিতেছে, আর একদিকে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে। একদিকে পাপের স্মৃতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখনই সে ভাব গোপনের জন্য কার্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে; এসব হৃদবৃত্তির জটিলতা, মনুষ্যস্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, সেক্ষপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই, পারিবেনও না। সেক্ষপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, সেক্ষপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মত সরলা মুগ্ধহৃদয়া

সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও, মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজবুত, ভাঙে না, মচকায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা, তোমার জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপরায়ণা পতিব্রতা যুবতী চাও, পোর্সিয়া আছে; জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে, তাহারই সর্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্খায় জর্জরিত হৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সঙ্কল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও, লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে, এগুলি সব মানুষ। অমন যে পাষাণহৃদয়া ম্যাকবেথপত্নী, যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।…নাটক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য কালিদাস দেখাইয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক বাকী আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না, তাহার জন্য সেক্ষপীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাসগ্রথিত সৌন্দর্য সেক্ষপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরূরবা, শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের প্রসপেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রসপেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। প্রসপেরো মূর্তিমান শান্তি, পরোপকার ক্ষমতা তাঁহার আভরণ। প্রসপেরোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য। আবার যখন ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয়, সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুটস, এণ্টনি, হ্যামলেট, এমন কি, ম্যাকবেথ এই বিবাদহেতু কোন কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচলবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে, ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী মনুষ্যের সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য কালিদাসের কোথায়?…

সেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্রবর্ণনা এক আশ্চর্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলস্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। যতবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নতুন নতুন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র ফলস্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোনস্ ফলস্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের

বিদূষকগুলি কোনো কর্মেরই নহে। জীবনশূন্য প্রভাশূন্য খোসামুদে বামুন মাত্র।...

...কালিদাসের বাহ্যজগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য, সেক্ষপীয়রের অন্তর্জগতে তেমনি। অন্তর্জগতেরও এক অংশে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে বোধহয় কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্বত্র সেক্ষপীয়র উপমাবিরহিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কালিদাস ও শেক্সপীয়র॥ বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ বৈশাখ

...তুমি বলেছ, সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে, তবে শেক্সপীয়রের নাটককে কী বলবে।

শেক্সপীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্সপীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারিনে। ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্ম-প্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য। অন্তরে বাহিরে এই রকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তি-বলে কেবল রাফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোকসংসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়। কিন্তু শেক্সপীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল ; নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হত। অতএব এক হিসাবে শেক্সপীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ, কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।

শেক্সপীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্সপীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে ; যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেসডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফলস্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়রের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেক্সপীয়রের মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।

...যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই, সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে।

শেক্সপীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্সপীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না— কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মতো অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মতো প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখানে থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথ। লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত পত্রাংশ॥ ১২৯৯

সংকলক : পার্থ বসু

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপীয়র : পূর্বাভাস

'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি' এই বলে যখন বাঙলার কবি শেক্সপীয়রকে প্রশস্তি নিবেদন করেছিলেন তখন তিনি কালিদাসের প্রতি হয়তো অবিচার করেছিলেন কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রতিভা সম্পর্কে কোনো অত্যুক্তি করেন নি। কবি-প্রকৃতি সম্পর্কে ডে লা মেয়ার লিখেছেন,—"It shares the life that is common to all men, but it possesses life in this kind more acutely and abundantly, and it has the faculty of communicating it." জীবনের সঙ্গে এই গভীর যোগ শেক্সপীয়রের মধ্যে আমরা পরিপূর্ণভাবে পাই, তাই তিনি শুধু মহৎ কবিই নন, আন্তর্জাতিক আবেদনের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ আর কোনো লেখক আছেন কিনা সন্দেহ। বড় কবি মাত্রই মানুষের কবি। তবে শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যে মানুষ এক দিকে paragon of animals ও অন্য দিকে quintessence of dust সেই মানুষের মনের গভীর গহনে যাঁরা কিছুটা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন শেক্সপীয়র তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। তাই সত্যই বলা যেতে পারে যে শেক্সপীয়র রোম-নগরীকে টাইবার-নদের তীরে আবিষ্কার করেন নি, মানুষের দুর্গম অন্তর প্রদেশে তিনি রোমকে খুঁজে পেয়েছেন। এই জন্যই শেক্সপীয়র সব যুগের সব দেশের পাঠকের কাছে সমানভাবে বরণীয়।

যে যুগে শেক্সপীয়র জন্মেছিলেন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে সে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়—Renaissance। মধ্যযুগের সংকীর্ণতার অবসান ঘোষণা করল এই নতুন যুগ। ধর্মতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের বাইরে কোনো কিছুই মধ্যযুগে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। সাহিত্য ও ললিতকলা ধিক্কৃত হওয়ার ফলে লুপ্ত হতে চলেছিল। রেনেসাঁস্ নতুন করে তাদের স্বীকৃতি দিল। মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করল। মানুষের মনকে অবদমিত রেখে ও তার দেহকে যন্ত্রণা দিয়ে যে রুদ্ধদ্বার জীবনকে মধ্যযুগে আদর্শ ধরা হত সে যে

কত বড় মিথ্যা তাও প্রমাণ করল। বুঝিয়ে দিল, বেঁচে থাকার অর্থ মরে থাকা নয়; যে আনন্দে গড়া মানুষের অঙ্গ তার কোনো অন্ত নেই। এই আনন্দকে অস্বীকার করে নয়, এই আনন্দকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে জীবনের সার্থকতা। মানুষের মন অসংখ্য বন্ধনের মাঝে সংকুচিত হতে থাকে, বাধা-নিষেধের নিগড় সরিয়ে নিলে তবেই তার স্বাভাবিক বিকাশ। আর বিকাশের অভাবে কিছুতেই মানুষ শান্তি পেতে পারে না। রেনেসাঁস্ মানুষের দেহমনকে বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে শিখিয়েছে। নতুন যুগের সবচেয়ে বড় আদর্শ তাই—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

এ-বাণী শেক্সপীয়রের নাটকের পাতায় পাতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি নিজে মহানগরের কোনো ধনী পরিবারের ঐশ্বর্যের মধ্যে যদি প্রতিপালিত হতেন তাহলে তাঁর মানুষের জন্য এত দরদ থাকত কি না সন্দেহ। যাই হোক, তাঁর জীবন-কাহিনীর অনেকটাই এখনও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। তাঁর যুগে সাহিত্যিকদের জীবনী লেখার বিশেষ প্রথা ছিল না। শেক্সপীয়রের জীবন সম্পর্কে যা জানা যায় তা সামান্য আর সে সম্পর্কেও সব সময় শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞগণ একমত নন। De Quincey অনেক দিন পূর্বে যে-কথা বলেছিলেন তা এত দিন পরেও বলা চলে: "That he lived, and that he died, and that he was a little lower than the angels : these make up pretty nearly the amount of our undisputed report."

ওয়ারইক্‌শায়ারের অন্তর্গত এভন্-নদীর তীরে স্ট্রাট্‌ফোর্ড শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের তৃতীয় সন্তানরূপে উইলিয়াম্ শেক্সপীয়রের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের তর্ক আজও শেষ হয় নি। সম্ভবত ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তাঁর জন্মদিন। (স্ট্রাট্‌ফোর্ডের হোলি ট্রিনিটি চার্চে ২৬শে এপ্রিল তারিখে এই জন্মের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সাধারণত জন্মের কয়েকদিন পরেই এটা করা হত।) তাঁর পিতা জন্ শেক্সপীয়র শুধু বিচক্ষণ ব্যবসায়ীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্ট্রাট্‌ফোর্ডের এক বিশিষ্ট নাগরিক। শেক্সপীয়রের মা মেরি আর্ডেন্-পরিবার থেকে এসেছিলেন। শেক্সপীয়র তাঁর *As you Like It* নাটকে এই Arden নামকে অমর করে রেখে গেছেন।

স্ট্রাট্‌ফোর্ডের স্কুলে শেক্সপীয়র শিক্ষালাভ করেন। লাটিন ভাষা তিনি নিশ্চয়ই মোটামুটি শিখেছিলেন, তবে গ্রীক বোধ হয় বিশেষ শিখতে পারেন নি। ১৫৭৭ সালের কাছাকাছি শেক্সপীয়রের পিতা আর্থিক অসুবিধায় পড়েন।

প্রচলিত আছে যে শেক্সপীয়রের স্কুলের পাঠ এই সময় বন্ধ হয় যাতে তিনি পিতার ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। ১৫৮২ সালে ১৮ বছর বয়সে তিনি অ্যান্ হ্যাথওয়েকে বিবাহ করেন। সম্ভবত ইনি পার্শ্ববর্তী শটারিগ্রামের রিচার্ড হ্যাথাওয়ের কন্যা। (এঁর বাড়ীর একাংশ এখনও আছে এবং 'অ্যান্ হ্যাথাওয়ের কুটীর' নামে পরিচিত।) অ্যান্ শেক্সপীয়রের চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। *Twelfth Night* নাটকে অর্‌সিনো ভায়োলাকে বলেছে, স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় হয়, তাহলে তার স্বামীর ভালোবাসা হারাবার ভয় থাকে। কেউ কেউ এই উক্তির মধ্যে শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত মত প্রচ্ছন্ন দেখেন। তাঁরা মনে করেন শেক্সপীয়রের নিজের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি। তাঁর প্রথম সন্তান একটি মেয়ে, নাম সুজানা। জন্ম ১৫৮৩ সালের মে মাসে। ১৫৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেক্সপীয়রের দুটি যমজ-সন্তান হয়, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলে হ্যাম্‌নেটের মৃত্যু হয় ১৫৯৬ সালে। মেয়ে জুডিথ শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন।

১৫৮৪ থেকে ১৫৯২ সাল পর্যন্ত শেক্সপীয়রের জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা জানা যায় না। কিংবদন্তী আছে, শেক্সপীয়র একবার সার্ টমাস লুসির হরিণ চুরি করেন। ১৫৯২ সালে শেক্সপীয়র লণ্ডনে এসেছিলেন জানা যায়, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে তিনি এখানে এসেছিলেন জানা যায় না। জীবনের বহু বিচিত্র দিকের অভিজ্ঞতার পরিচয় আমরা শেক্সপীয়রের নাটকে পাই। সেই সব অভিজ্ঞতা শেক্সপীয়র এই কয় বছরে আহরণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমসাময়িক যে সব খ্যাতনামা নাট্যকারেরা এই সময় নাটক লিখছিলেন (Marlowe, Psele, Nashe প্রভৃতি), শেক্সপীয়র ক্রমশ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। ১৫৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাট্যকার গ্রীণের মৃত্যুশয্যা থেকে লেখা এক চিঠি থেকে এ খবর আমরা জানতে পারি। প্লেগ-রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য যে সময় রঙ্গালয় বন্ধ থাকে সেই সময় শেক্সপীয়র তাঁর কাব্য রচনা করেন, ১০৯৩ সালে '*Venus and Adonis* ও ১৫৯৪ সালে *The Rape of Lucrece*। এই দুটি কাব্যই শেক্সপীয়র সাদাম্পটনের আর্লকে উৎসর্গ করেন। ১৫৯৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেক্সপীয়র লর্ড চেম্বারলিনের অভিনেতৃদলের অংশীদার হন। ১৫৯৯ সালের পর শেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকই গ্লোব-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৫৯৫ থেকে ১৬০০ সালের

মধ্যে শেক্সপীয়র তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। তবে ১৬০৯ সালের পূর্বে এগুলি মুদ্রিত হয় নি। ১৫৯৬ সালে শেক্সপীয়র পরিবারের কুল-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা নিজস্ব প্রাবরণ-চিহ্ন (coat-of-arms) লাভ করেন। এর পরের বছর শেক্সপীয়র New Place নামে বাগান-বাড়ি কেনেন। কিন্তু ১৫৯৭, ১৫৯৯ ও ১৬০৪ সালে তাঁকে লণ্ডনে থাকতে দেখা যায়। শেক্সপীয়র নিজেও মাঝে মাঝে অভিনয় করেছেন, প্রধানতঃ ১৫৯৮ সালের আগে। কথিত আছে, তিনি যে সব ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার মধ্যে *As You Like It* নাটকের ভৃত্য Adam-এর চরিত্র অন্যতম। ১৬১০ সালের কাছাকাছি শেক্সপীয়র ষ্ট্রাটফোর্ডে ফিরে আসেন। ১৬১৩ সালের পরে বোধ হয় তিনি আর কিছু লেখেন নি। ১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়রের মৃত্যু হয়। প্রচলিত আছে, ড্রেটন্, বেন্ জন্‌সন্ প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে এক প্রমোদভোজনে অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন ও সেই জ্বরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধির উপর এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উৎকীর্ণ আছে :

Good friend, for Jesus' sake forbear
To dig the dust enclosed here ;
Blest be the man that spares these stones,
And curst be he that moves my bones.

এগুলি শেক্সপীয়রের নিজের লেখা হওয়া অসম্ভব নয়।

শেক্সপীয়রের বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে।

শেক্সপীয়রের নাটকগুলি রচনাকালের পৌর্বাপর্ব অনুসারে সাধারণত চারিটি যুগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম যুগের পরিধি হল ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৫ সালের কাছাকাছি। এ যুগের লেখা নাটকগুলি হল ঐতিহাসিক নাটক, কমেডি ও ট্র্যাজেডি। উদাহরণ স্বরূপ *Richard II, A Midsummer Night's Dream* ও 'Romeo and Juliet' এর নাম করা যেতে পারে। নাট্যরচনার প্রথম যুগে শেক্সপীয়র কিছুদিন অন্য লেখকের লেখা সম্পাদন, সংশোধন ও মঞ্চোপযোগী করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য কতকগুলি নাটকে কতটা অংশ তাঁর লেখা তা অনিশ্চিত। রচনা-শৈলী সব সময় এক নয়, এবং

Richard III প্রভৃতি কয়েকটি নাটক পরীক্ষামূলক ভাবে লেখা হয়েছে মনে হয়। এই যুগের অন্যান্য নাটক হল—ঐতিহাসিক: *1 Henry VI, 2 Henry VI, 3 Henry VI*; কমেডি: *The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, Two Gentlemen of Verona*; ট্র্যাজেডি: *Titus Andronicus.*

১৫৯৫ থেকে ১৬০১ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। বিখ্যাত কমেডিগুলি ও ফলস্টাফের ভূমিকা সংবলিত ঐতিহাসিক নাটক দুটি এই যুগের রচনা। এ যুগের নাটকগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডি নেই। এ যুগটিকে তাই সাধারণতঃ 'comic' যুগ বলা হয়। নাটকগুলির ছন্দ সাবলীল ও সুর সুললিত। এই যুগের নাটক—ঐতিহাসিক: *King John, 1 Henry IV, 2 Henry IV Henry V*; কমেডি: *The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew, Much Ado about Nothing, As You Like It, The Merry Wives of Windsor, Twelfth Night.*

তৃতীয় যুগে (১৬০১-১৬০৮) রয়েছে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি চারটি—*Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth,* রোমান্ নাটকগুলি, আর কয়েকটি তথাকথিত কমেডি, যেগুলিতে ভালোর আলোর চেয়ে মন্দের আঁধার অনেক বেশি। এই যুগের শেষের দিকের নাটকগুলিতে কবিতার শৈলীতে দৃঢ়তা এসেছে আর একটা অসংলগ্নতার ভাব আছে। যেন শব্দের যেটুকু অর্থ বোধগম্য করার সামর্থ্য আছে জোর করে তার চেয়ে বেশি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ যুগের অন্যান্য নাটক হল—কমেডি: *All's well that Ends well, Troilus and Cressida, Measure for Measure*; ট্র্যাজেডি: *Julius Caesar, Timon of Athens, Antony and Cleopatra. Coriolanus.*

শেষ বা রোমান্টিক যুগ হচ্ছে ১৬০৮ থেকে ১৬১২, এই চার বছর। *Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest* এই তিনটি নাটক ও *Pericles*-এর খণ্ডাংশ এই সময়ের লেখা। কবিতার শৈলীর দিক থেকে শেষের দিকের ট্র্যাজেডিগুলির সঙ্গে এই রোমান্সগুলির বিশেষ পার্থক্য নেই। কাব্যিক সৌন্দর্যই এগুলির প্রধান আকর্ষণ। শহর থেকে দূরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এই নাটকগুলির প্রাণকেন্দ্র। মিরাণ্ডা, পার্ডিটা, ইমোজেন প্রভৃতি নায়িকাদের স্বাভাবিক রমণীয়তা নিসর্গের আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে

উঠেছে। নাটকীয় দিক থেকে দেখলে অবশ্য এই রোমান্সগুলিতে গঠনগত শৈথিল্য দেখা যায়। অনেক ভুলত্রুটি চোখে পড়ে।

শেক্সপীয়রের জীবনদর্শন কি ছিল তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নাট্যকার দার্শনিক নন, আর তাঁর উদ্দেশ্যও নীতিশিক্ষা দেওয়া নয়। জীবনতীর্থের পথে অনেক তীর্থযাত্রীর ভিড়। পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেক্সপীয়র তাঁদের দেখেছেন। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে, সমালোচকের ভূমিকায় নয়। এই পথ-চাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। রোমিওর ভাষায় তিনি বলতে পারতেন: "I shall be the candle-holder and look on." নিজের মত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার কোনো প্রকৃত পথ নাট্যকারের নেই। তাঁর চরিত্রগুলির উক্তিকে তাঁর উক্তি বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়। আর তাছাড়া একটি চরিত্রের কোনো উক্তিতে যে-মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে, অন্য আর একটি চরিত্রের কোনো উক্তিতে অনেক সময় তার বিপরীত মত পোষণ করা হচ্ছে। দুটি চরিত্রই শেক্সপীয়রের সৃষ্টি। দুটি উক্তিই তাঁর নিজের রচনা। এর মধ্যে কোন উক্তিটি শেক্সপীয়রের নিজস্ব মনোভাবের অভিব্যক্তি বলে ধরা হবে? 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ব্রুটাসকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের দুর্দশার জন্য দোষী আমরা নিজেরা, আমাদের ভাগ্যতারকারা নয়। আবার ডেন-রাজকুমার বলছেন, এক ঐশী শক্তি রয়েছে যার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শেক্সপীয়র দৈবকে সার্বভৌম মনে করেন, না পুরুষকারকে? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। হ্যামলেটের উক্তি "Frailty, thy name is woman!" শেক্সপীয়রের মনের কথা, না তিনি অরসিনোর সঙ্গে বলবেন:

> ···however we do praise ourselves,
> Our fancies are more giddy and unfirm,
> More longing, wavering, sooner lost and worn,
> Than women's are—?

তবে মানুষের ভাবপ্রবণ মন সব সময় যুক্তিতর্ক মেনে চলে না। তাই শেক্সপীয়রের নাটক থেকে তাঁর জীবনদর্শন খুঁজে বার করার চেষ্টার অন্ত নেই।

প্রসপেরো বলেছেন শেক্সপীয়রের শেষ লেখায়:

> "···We are such stuff
> As dreams are made on and our little life
> Is rounded with sleep."

এই উক্তিটিকে অনেক সময় শেক্সপীয়রের উক্তি বলে ধরা হয়। গ্রীক কবি পিন্‌ডার বলেছেন, জীবন ছায়ার স্বপন। স্প্যানিশ নাট্যকার ক্যাল্‌ডেরোন-এর কাছে জীবন একটা স্বপ্ন। ক্যাল্‌ডেরোন-এর কাছে জীবনটা স্বপ্ন, আর প্রসপেরোর কাছে আমরা সকলেই স্বপ্ন। (স্বপ্ন আবার স্বপ্ন দেখে।) *All's Well that Ends Well* নাটকে একটি উক্তি আছে, সেটি শেক্সপীয়রের নিজস্ব হওয়া বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। সেটি হচ্ছে : "The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together." সংসারে ভালো-মন্দ দুই আছে, এবং এইজন্যই আমাদের সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এটা সম্ভব হয় যখন আমরা স্বার্থ ভুলে গিয়ে অন্যকে ভালোবাসতে পারি। নিজের ক্ষুদ্র সুখ বিসর্জন দিতে পারি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য। তখনই মানুষের চিত্ত শত দুর্বিপাকেও অপরাজিত থাকতে পারে। মৃত্যু থেকে সে ভয় পায় না, মৃত্যু তার জীবনকে দেয় নতুন মহিমা। সে বলতে পারে :

I will play the swan,
And die in music.

হ্যামলেট বলেছেন : "Readiness is all"। এই বোধ হয়, শেক্সপীয়রের মতে, মানুষের ধর্ম।

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

হমফ্রে হাউস

শ্যামা

আমার বিশ্বাস, আধুনিক যুগে যদিও কবির অভাব নেই, তবু কবিতা-পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। সেইজন্যই বর্তমান প্রবন্ধ একেবারে অসার্থক নয়, কেবল কালাতিক্রান্ত। কারণ এখানে আমি যে কাব্যসংগ্রহের গুণগানে উদ্যত, সেই প্রণয়সংক্রান্ত কবিতাবলী কিছুদিন আগে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তার বিষয়ে ইদানীন্তন সুধীসমাজের ঔৎসুক্য যতটা মৌখিক, ততটা চাক্ষুষ নয় ; এবং সঞ্চয়নখানির প্রণেতা অনামিক ও অজ্ঞাতকুলশীল হলেও, রচনাগুলির উৎকর্ষ, আমার মতে, এতই নিঃসন্দেহ যে সে-সম্বন্ধে জনসাধারণের নিরাগ্রহ সর্বতোভাবে শোচনীয়।

কিন্তু, পুস্তকখানি নামেই সঙ্কলন, আসলে তার মধ্যে কোনো আনুপূর্বিকতা নেই, কোনোমতেই বলা যায় না যে সকল কবিতা একমাত্র রমণীকে উৎসর্গিত। এবং যদি বা একাধিক কবিতা একই নারীর উদ্দেশে লেখা হয়ে থাকে, তবু সেগুলির রচনাকাল নিশ্চয়ই বিভিন্ন। তাতে প্রেমানুভূতির নানারূপের সঙ্গে বিষম বিদ্বেষের প্রকারভেদ ফুটে উঠেছে ; এবং কবির প্রিয় বা প্রেয়সী-পরম্পরার মতিগতিও সেখানে এক নয়, বিচিত্র ও বিবিধ।

তবে শুধু বৈচিত্র্যের খাতিরেই আমি আজ এ প্রসঙ্গের অবতারণা করি নি। এতদিন পরে এ বিষয়ে বাক্যব্যয়ের বিশেষ কারণ এই যে উক্ত কবিতাগুলি নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের লেখা বটে, কিন্তু কোনো ইংরেজ স্ত্রীলোক সেগুলোর উপলক্ষ্য নয়। সম্প্রতি বইখানা আবার পড়তে পড়তে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কবির প্রিয়তমারা ভারতবর্ষীয়া। কবিতার পর কবিতায় প্রেমিক রূপসী নায়িকার শ্যাম সমারোহের গুণ গেয়েছেন :

……my mistress' brows are raven black,
Her eyes so suited……

……every tongue says beauty should look so.

অতএব এতে সন্দেহ নেই যে কবির বাঞ্ছিতা প্রায় নিকষ কালো ছিল এবং

কৃষ্ণকান্তিই কবিকে অনিবার্য আকর্ষণে টানত। সুন্দর আর শ্বেতবর্ণের মধ্যে যে-শব্দগত সংযোগ এদেশের একাধিক ভাষায় পরিস্ফুট, আমাদের লেখক সেই সাধারণ কুসংস্কার এবং অন্তত আমার মতে, ভ্রান্ত গৌরীপ্রীতির পৃষ্ঠপোষক নন। তাঁর অকপট প্রেয়সী যেহেতু আধুনিকাদের মতো পাউডার প্রলেপে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে নি, তাই তার অঙ্গরাগ থেকে বেগুনী রঙের হাস্যকর আভাও হয়তো ফুটে বেরোত না :

Then will I swear beauty herself is black,
And all they foul that thy complexion lack.

আমার অনুমান, কাব্যোল্লিখিত ভারতবাসিনীদের মধ্যে অন্তত একজন ছিল বাঙালী। কারণ নারীদেহের একটি বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সদাসর্বদা আকৃষ্ট ও উত্তেজিত করত ; প্রেয়সীর চোখের বর্ণনায় কখনও তার ক্লান্তি আসে নি। নিবিড় কালো চোখের সে-রকম রোমাঞ্চকর জৌলস শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব ; এবং সে সম্মোহনে স্বয়ং বাঙালী কবিদের মনও বারম্বার মজেছে। অবশ্য আমি রবীন্দ্রনাথের সেই মেয়েটির কথাই ভাবছি, যে একদিন ময়নাপাড়ার মাঠে কালো হরিণ চোখ আকাশে তুলে আসন্ন বর্ষার মেঘসমাগম দেখেছিল ; কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠক এখনই আরো হাজারটা দৃষ্টান্ত ভেবে নেবেন।

সে যাই হোক, আমাদের কবি উদ্ধৃতাংশে বলেছেন :

······my mistress' brows are raven black,
Her yes so suited······'.

অন্য একটি কবিতার শুরুতেই তিনি লিখেছেন :

Thine eyes I love······'

অন্যত্র দেখতে পাই তিনি

Commanded by the motion of her eyes,

এবং উপান্ত কবিতাতে মদন নিজে তার সংক্রামক উদ্দীপনার আগুন কবিপ্রিয়ার চোখের আলোয় জ্বালিয়ে নিয়ে যান। অতএব আমাদের কবি স্বভাবতই চোখের জন্যে পাগল। এমন কি উপমিতির প্রসাদে নিজের চোখ সম্বন্ধেও তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই। এবং চোখের প্রবঞ্চনায় বারম্বার প্রতারিত তিনি শেষ পর্যন্ত সেই চোখেরই অন্ধ স্তাবক :

O ! how can love's eyes be true
That is so vex'd with watching and with tears ?

ক্রমবর্ধ প্রত্যাখ্যানের ফলে তাঁর প্রেম যখন বিদ্বেষে বদলায়, তখন তিনি যদিও কবিতার প্রারম্ভেই লিখে বসেন :

My mistress' eyes are nothing like the sun,

তবু চাহনির আজ্ঞালঙ্ঘন তাঁর সামর্থ্যে কুলোয় না, বরং ক্রয়েডী তুরুক্তির আড়াল থেকে আপনার হাস্যকর দাসত্বই ফুটে বেরোয় :

If hairs be wires, black wires grow on her head.

এখানে পদটির অনিশ্চয়তা দ্রষ্টব্য : আসলে নরম চুল একাধারে আধি-ব্যাধির লক্ষণ এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতীক। তাঁর অভিসার নিশ্চয়ই সমতল পথে চলত না।

আমার বিশ্বাস, ফ্রীডাসে প্লেটো ঐশী উন্মাদনার যত রকম প্রকারভেদ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলির সর্বসাধারণ লক্ষণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা ; এবং ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন যে ঐ জাতীয় উত্তুঙ্গ মনোভাবের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের অকিঞ্চিৎকর সমভাবের বিরোধ বাধে বলেই উক্ত ব্যাধি অতখানি অসহ্য লাগে। তা হলেও মানুষের সকল দুর্মূল্য অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই পতন-অভ্যুদয়ের ডায়ালেকটিক অন্তর্নিহিত থাকে ; এবং আজ পর্যন্ত কোনো প্রেমার্ত ব্যক্তিই এই উভবল দ্বৈতবোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। যারা শুধু কবি নয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেমিক, তাদের ক্ষেত্রে বিবিধ উন্মাদনা যেহেতু একত্র বর্তমান, তাই সাংঘাতিক অন্তর্বিরোধেও তারা অদ্বিতীয় ; তাই পার্থিবাকে সম্পূর্ণভাবে সমাজাতিরিক্ত ভাবা তাদেরও সাধ্য নয়। আলোচ্য সঙ্কলনে এই মর্মান্তিক দ্বন্দ্বসমাসই একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতার অবলম্বন। নিম্নলিখিত পংক্তি কটায় আমাদের কবি শুধু অবজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাতই নয়, এমন কি হয়তো প্রাণাধিকার সাক্ষাৎকারেও প্রতিবিদ্ধ ; তবু তার উপরে চোখ পড়তেই প্রেমিক উত্তেজনায় কি : মৃতপ্রায় কোনো এক জনবহুল স্থানে উভয়ের অপ্রত্যাশিত সন্নিকর্ষ ঘটায় চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কারো দিকে তাকাতে কবি বলেছেন :

ah, my love well knows
Her pretty looks have been my enemies,
And therefore from my face she turns my foes,
That they elsewhere might dert their injuries :
Yet do not so ; but since I am near slain,
Kill me outright with looks and read my pain.

পরবর্তী কবিতা আরো বেশি কৌতূহলপ্রদ : এটিও সম্ভবত একই স্ত্রীলোকের উদ্দেশে লেখা, এবং সে-নারীর উপেক্ষা এখনো অবিকৃত : বোধহয় কবি কিছুদিন আগে তাকে চিঠি বা কবিতা পাঠিয়ে আজও কোনো জবাব পান নি :

Be wise as thou art cruel ; do not press
My tongue-tied patience with too much disdain ;
Lest sorrow lend me words and words express
The manner of my pity wanting pain.
If I might teach thee wit, better it were,
Though not to love, yet, love, to tell me so ;
As testy sick men, when their death be near,
No news but health from their physicians know ;
For if I should despair, I might grow mad,
And in my madness might speak ill of thee :
Now this ill-wresting world is grown so bad,
Mad slanderers by mad ears believed be.
 Thal I may not be so, nor thou belied,
 Bear thine eyes straight, though thy proud
 heart go wide.

সহজ ভাষায় এর অর্থ এই যে কবি তাকে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে অভীষ্ট-সিদ্ধির আয়োজনে অগ্রসর ; এবং যেস্থানে তাঁর বাস সে স্থান যে রটনার পক্ষে অতিশয় উর্বর, তাও তার অজ্ঞাত নয় :

Now this ill-wresting world is grown so bad
Mad slanderers by mad ears believed be.

নায়িকা যদি জবাব না দেয়, এবং তার উত্তরে যদি অন্তত প্রেমের ভান না থাকে, তবে কবি তার বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচারে নামবেন। এবং সে-কুৎসা কি ? তিনি লোকসমাজে শুধু এটুকুই বলবেন যে মেয়েটি নিতান্ত নির্বোধ :

Be wise as thau art cruel···.

এবং If I might teach thee wit ··

এই কবিতাটি রচনাকালে তিনি নির্ঘাত ভেবেছিলেন যে সে বস্তুতই অত্যন্ত নির্বোধ ; এবং তার দীর্ঘায়িত নীরবতায় ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে উঠে তিনি

লোকসমক্ষেও সে সত্য ঘোষণার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন, যাতে সারা সমাজ তার প্ররোচনায় মেয়েটির বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ অভীপ্সা আর নীচতার যোটানায় তিনি শত্রুদলে যোগ দিতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁর নিরাশার কবিতাগুলিও বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এদেশে কৃষকরমণীরাই এ চিত্রকল্পের নির্ভর :

Lo, as a careful houswife runs to catch
One of her feathered creatures broke away,
Sets down her babe and makes all swift dispatch
In persuit of the thing she would have stay,
Whilst her neglected child holds her in chase.
Cries to catch her whose busy care is bent
To follow that which flies before her face,
Not prizing her poor infant's discontent
So run'st thou after that which flies from thee,
Whilst I thy babe chase thee after behind,
But if thou catch thy hope, turn back time
And play the mother's part, kiss me, be kind,···

প্রেয়সীর সঙ্গে তার নিজের সম্বন্ধ আর মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ, এই দুই সম্বন্ধের তুলনা পূর্বোক্ত কবিতার "pity wanting pain"-এর অভিব্যক্তি ; এবং যাঁরা এখনও ঈডিপাস গ্রন্থিতে আস্থা রাখেন, তাঁরা উল্লিখিত পংক্তিগুলোয় সে-মনোব্যাধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাবেন। এ-প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের নাম নেওয়া যদি মার্জনীয় হয়, তবে অন্যান্য মনোবিদেরা বুঝবেন যে এখানে আমাদের কবিও শেক্সপীয়রের মতোই গর্ভগৃহকে সমাধিমন্দিরে পরিণত করছেন—making his tomb the womb wherin he grew। যাঁরা মনোবিজ্ঞানী নন, তাঁদের কাছে এ-কবিতার সমাজতাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছে এই যে সমাজব্যবস্থায় মাতৃ-প্রাধান্য সত্যই দুর্মর ; এবং আমার মতো মামুলী মানুষের কাছে কবির সুপ্রকট দৈন্যগ্রন্থি এই সাধারণ সত্যেরই সাক্ষ্য যে পুরুষমাত্রেই স্ত্রীজাতির অঞ্চলাশ্রয়ী।

কবিতাটির যে ব্যাখ্যাই করা যাক না কেন, এতে সন্দেহ নেই যে কালীপূজার মূলেও অনুরূপ প্রত্যয়ই ক্রিয়াশীল ; সেই মসীবরনা বিশ্বজননীর

প্রতীকে সৃষ্টি ও ধ্বংসের স্বতোবিরোধী সমন্বয় আরও সুপ্রকট ; এবং আলোচ্য কবিতাসমূহের একটাকে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, কালীস্তোত্র বলেই বোধ হয়। আমাদের কবি যে বাংলাদেশকে জানতেন তার অকাট্য প্রমাণ এই কবিতাটি, এবং সেই জন্যে এটিকে আমি আগাগোড়া উদ্ধৃত করছি :

Thou art as tyrannous ; so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel :
For well thou know'st to my dear doting heart
Thou art the fairest and most precious jewel.
Yet, in good faith, some say that thee behold
Thy face hath not the power to make love grown :
To say they err, I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone.
And, to be sure, that is not false I swear,
A thousand groans, but thinking on thy face.
One on another's neck, do witness bear
Thy black is farest in my judgement's place
In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slander, as I think, proceeds.

এই কবিতাটি যে কালীর বন্দনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিশ্চয়ই এই অংশটুকু :

A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another's neck, do witness bear
The black is farest……

অন্বয়ের খাতিরে পংক্তি কটার এইরূপ ব্যাখ্যা করাই বোধ হয় সমীচীন : "কেবল তোমার মুখের ধ্যান করলেও আমার হৃদয় সহস্র দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিদীর্ণ হয় ; এবং সে দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলোর মধ্যে তিলার্ধ ব্যবধান থাকে না, একটা আসে আগেরটার গলায় ভর দিয়ে।" এ ব্যাখ্যা সকলেই নিশ্চয় নির্বিবাদে মেনে নেবে। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাবচ্ছবি—দীর্ঘনিঃশ্বাসের গলা! তবু এখানে শব্দবিন্যাস দ্রষ্টব্য ; এবং যুক্তি-শৃঙ্খলার কথা বাদ দিলে "One on another's neck—" পদটার স্থান, 'groans'-এর পরে নয়, 'face'-এর অব্যবহিত পরে। এখন আমরা যদি ভাবতে পারি যে এখানে কবির মানসপটে কালী-প্রতিমা

ফুটে উঠেছিলো, তবেই তাঁর চিন্তাধারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় ; কারণ কালীর যে মূর্তি আবালবৃদ্ধবনিতার উপাস্য, তাতে তিনি নরমুণ্ড-মালিনী, এবং এই কপালমালায় মাথাগুলো বাস্তবিকই গলাগলি করে আছে। সুতরাং কাব্য রচনার একটা অতিসাধারণ ঘটনার নিদর্শন এই পংক্তি কটায় লিপিবদ্ধ রয়েছে : যে চিত্রকল্প মুখ্যত চক্ষুসম্পর্কিত, তার অঙ্গবিশেষ মূল অর্থ হারিয়ে, নিকটবর্তী বাক্যে নিহিতোপমার পদে প্রতিষ্ঠা পেয়ে অনধিকার চর্চা করছে। কাব্য রচনার সাম্প্রতিক বিশ্লেষণমাত্রেই দেখিয়েছে যে এই জাতীয় রূপান্তর সকল কবিতাতেই সুলভ। এবং এখানে যখন ছন্দের প্রয়োজনে শব্দবিন্যাস এই রকম ন্যায়াতিরিক্ত অর্থের অনুকূল, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাসের গলা দেখেও আশ্চর্য হওয়া অনুচিত।

ফলত আমরা মানতে বাধ্য যে কবির মনে কালীমূর্তি মুদ্রিত ছিল। কিন্তু দেবী আর মানবীর মধ্যে তিনি স্পষ্টত বিশেষ পার্থক্য করেন নি ; অসংখ্য ভারতীয় লেখকদের মতো তাঁর ক্ষেত্রেও একজন অপরের বাদ সাধেনি, একই পাত্রে উভয়ের সাযুজ্য ঘটেছিলো। তবে উদ্ধৃত কবিতার শেষের দু লাইন থেকে বোঝা যায় যে কালীপূজার অন্তর্নিহিত ধর্মতত্ত্বটুকুর অনেকখানিই তাঁকে এড়িয়ে গেছে, সে-সর্বনাশীর মধ্যে সৃষ্টির আকুতি তিনি বড় একটা দেখতে পাননি, সাধারণত তার খামকা খেয়ালই লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন "Black in thy deeds" ; এবং সে উক্তির মধ্যে হয়তো বিদেশ সম্বন্ধে আগন্তুকের প্রথম ভুল-চুকগুলোই টিঁকে আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইচ্ছাকৃত অবিদ্যাই তাঁর সাময়িক অবস্থাকে বেশি মানায় ভেবে তিনি এই কবিতায় পূর্ণ জ্ঞানের দিকে এগোতে চাননি। কারণ শুনেছি যে কালবিনাশিনী মহাকালীর সংহার মূর্তি মায়াজালমাত্র, প্রকৃত ভক্ত সে বাধা মানে না ; বিশ্বজননীর নির্দেশে সে শেষ পর্যন্ত মোক্ষের জ্যোতির্ময় শান্তিতেই পৌঁছায়। নিম্নোক্ত পদ রচনার সময় আমাদের কবিও একথা নিশ্চয় বুঝেছিলেন :

So runn'st thou after that which flies from thee
Whilst I thy babe chase thee after behind,

আশা করি উদ্ধারের সাহায্যে আমি দেখাতে পেরেছি যে এই কবিতাগুলির মর্মদৃষ্টি বিশ্ব-বিস্তৃত আবেগ প্রভৃত শক্তিশালী, পদ নির্বাচন ও পদান্বয়ের প্রতিভা অসাধারণ এবং বিষয়বস্তু কবির অতিগভীর ও বহুবিচিত্র ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয়তো এই শ্যামাঙ্গিনী কে, সে সমস্যারও সমাধান করেছি। সে রমণী কোন একজন স্ত্রীলোক নয়, অনেক বাঙালী মেয়ের সমন্বয়ে তার উদ্ভব। তাদের মধ্যে কেউ সুন্দরী, কেউ কুরূপা, কেউ দয়াবতী, কেউ মর্মান্তিক, কিন্তু তারা সকলেই মহাকালীর অংশভাক্‌, যার মধ্যে সেই পরস্পরবিরোধী কৃষ্ণার দল সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য পায়।

কিন্তু আমার পাঠকেরা নিশ্চয়ই কবি পরিচিতির জন্যে উৎসুক হয়েছেন। অনেক বছর ধরে অবিবেকী কাব্যবিবেচকেরা বিশ্বাস করতেন যে এই কবিতা সমষ্টির রচয়িতা শেক্সপীয়র, কারণ কবিতাগুলিকে একত্রে সংগ্রথিত করে টমাস থর্প নামক কোনো এক কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি এই অনামাঙ্কিত কাব্য-সঙ্কলনখানি 'পরবর্তী সনেটসমূহের একমাত্র জনক'—The onlie begetter of these insuing sonnets Mrs. W·H'-কে উৎসর্গ করেন। এখনও শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত কবিতাগুলো ১২৭ থেকে ১৫৪ নম্বরের সনেট বলেই স্থান পায়; কিন্তু আজ আর নামকরা এমন কোন পণ্ডিত নেই যিনি নিঃসন্দেহে সবগুলোকে শেক্সপীয়রের রচনা হিসাবে দেখেন। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। কারণ অত্যাধুনিক শেক্সপীয়র সমিতিগুলোও এখনো এ অনুমানের কোন প্রমাণ পাননি যে শেক্সপীয়র ইংল্যাণ্ডের বাইরে খুব বেশি বেড়িয়েছিলেন অথবা ৯৮ নম্বরের সনেটটি ব্রাউনিং-এর Home Thoughts from Abroad কবিতাটির পূর্বাভাস। এ ধারণার পক্ষেও কোন সাক্ষ্য নেই যে শেক্সপীয়র যদি এ দেশে এসেই থাকেন, তবে ভারতের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে যতদিন এখানে থাকা দরকার তিনি ততদিন প্রবাসে কাটিয়েছিলেন। সুতরাং অগ্রগামী গবেষণার আশাপথ চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে Times Literary Supplement যে দেশকে কবিতার লীলাভূমি বলেছে সে দেশের সম্মোহে অভিভূত একজন ইংরেজের সম্বেগ, প্রজ্ঞা, আত্মনিগ্রহ ও তিক্ততার সার্বজনীন অভিব্যক্তিই রসিকের পিপাসা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট।

[এই প্রবন্ধের প্রকরণ জনসন্‌, কোল্‌রিজ, সুইনবর্ন, রিচার্ডস, গ্রেভস ও এম্‌সন ইত্যাদি একাধিক মনীষীর দ্বারা উদ্ভাবিত, এর বক্তব্যের একমাত্র জনক, the onlie begetter, আমি।]

। পৌষ ১৩৪৪ ।

শেক্সপীয়রের সনেট

অতিদৈব

আমার ভয়ার্ত বুদ্ধি, কিংবা সেই চিন্ময় পুরুষ,
যার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি সমাহিত অনাগত কালে,
জানে না আমার প্রেম কি সত্যের গুণে নিরঙ্কুশ,
কেন তার পরমায়ু ন্যস্ত নয় ভাগ্যের খেয়ালে।
রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রত্যাগত অমৃতে আবার;
দুঃখবাদী গণকেরা উপহাস্য নিজেদের কাছে;
সংশয়ের নিপাতনে অব্যাহত প্রমার উদ্ধার;
যে শান্তি আরব্ধ আজ, অনন্তের স্ফূর্তি তাতে আছে।
উপস্থিত সন্ধিলগ্ন, সুযোগের দিব্য রসায়নে
পুনরুজ্জীবিত প্রেম; মৃত্যু মোর পদানত দাস।
নির্বাক নির্বোধ যারা, অভিভূত তারাই মারণে;
এই অকিঞ্চন কাব্যে অপরাস্ত আমি, অবিনাশ।
সেদিনও তোমার স্মৃতি প্রকীর্তিত রবে এ সঙ্গীতে
রাজাদের জয়স্তম্ভ মিশে যাবে যেদিন ধূলিতে॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

(৬৬)

মৃত্যুর বিশ্রাম চাই, পরিশ্রান্ত আমি এই সবে:
যোগ্যতা জন্মায় কত দেখেছি যে ভিখারীর ঘরে,
আর দীন নেতি ধড়াচূড়া পরে দেখেছি উৎসবে,
আর শুদ্ধ বিশ্বস্ততা কর্দমাক্ত গ্লানির গহ্বরে,
আর স্বর্ণময় মান লজ্জাকর অপাত্রে গচ্ছিত,
আর সতী গুণাবলী পণ্যস্ত্রীর মত উপগত,

আর ন্যায্য শ্রেষ্ঠত্বও অন্যায়ের তাচ্ছিল্যে লাঞ্ছিত
আর শক্তি বিকলাঙ্গ খঞ্জের প্রতাপে অপহৃত,
আর শিল্পকলা মূক শাসকের দুরন্ত দাপটে,
আর আচার্যের মতো নির্বুদ্ধিই নৈপুণ্য চালায়,
আর স্বচ্ছ সত্য দেখি স্থূলবুদ্ধি অপনামে রটে,
আর ক্রীতদাস সৎ মালিক মন্দের পিছু ধায় :
পরিশ্রান্ত এই সবে, এ সবের থেকে যেতে চাই,
শুধু জানি মৃত্যু সে যে ফেলে যাওয়া প্রিয়াকে একাই ॥

বিষ্ণু দে

(৬২)

সম্পূর্ণ আমার চোখে ভর করে পাপ আত্মরতি
সমগ্র আত্মায় আর অঙ্গে অঙ্গে তাহার নির্ভর ;
অন্তরের অন্তস্তলে তার হেন সুবদ্ধ বসতি
প্রতিকারহীন তাই সে-কল্মষ। ভাবি অতঃপর
আমার মুখের তুল্য নাহিক' সুঠাম মুখচ্ছবি
নাই মূর্তি এত সত্য, নাই সত্য এত মূর্তিমান
এবং নিজের মুখে স্বীয় স্বস্তিরচন সম্ভবই
আমি যথা সর্বগুণে সবা হতে পরিবর্ধমান।
তবুও দর্পণ যেই স্বমূর্তিতে দেখায় আমাকে
লাঞ্ছিত খণ্ডিত খিন্ন পোড়-খাওয়া প্রৌঢ়ির প্রহারে
তখন সে-আত্মপ্রেম বিপরীতবুদ্ধি, দেখি তাকে
আত্মরতিতৃপ্ত সত্তা, মনে হয়, অপরাধ কাড়ে।
যে-আমির প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ, সে তো তুমি,
তোমারই যৌবনরঙে রাঙালাম মম বয়োভূমি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(২৭)

শ্রমে পরিশ্রান্ত আমি ছুটে যাই আমার শয্যায়,
পর্যটনক্লান্ত পদ পেতে চায় প্রশান্তি মধুর ;
তখন মস্তিষ্কে ঢেউ অন্য এক নবীন যাত্রায়,
হৃদয়ের কাজ শুরু দেহ যবে শ্রান্তি ভরপুর।
যেহেতু আমার চিন্তা তখন আবাস ছেড়ে দূরে
তোমার সন্ধানে ধায় তীর্থযাত্রী উদ্যোগপ্রস্তুত,
এবং আমার দুটি শ্রান্ত চোখ উন্মোচিত ক'রে
দ্যাখে সেই অন্ধকার অন্ধ ব্যক্তি যা দ্যাখে অন্তত।
আমার হৃদয় শুধু প্রসারিত কল্পনাদৃষ্টিতে
তোমার ছায়াকে আনে দৃষ্টিহীন দৃশ্যের সমুখে
সে-মূর্তি হিরকসম দেখা গেলে ভয়াল রাত্রিতে,
কালরাত্রি রূপময়, নব্যকান্তি তার জীর্ণ মুখে।
দ্যাখো সর্ব অঙ্গ দিনে রাত্রিকালে আমার হৃদয়
তোমার আমার জন্যে নিমগ্নতা খুঁজেও না পায় ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

(১)

এক থেকে বহু হোক এ সংসারে যারা কান্তিমান,
সৌন্দর্যগোলাপ যাতে চিরদিন মর্ত্যে বেঁচে রয়,
প্রৌঢ় থেকে ক্রমে বৃদ্ধ তারপর মৃত্যুতে শয়ান,
তবু তার স্মৃতিটুকু রয়ে যাক সন্তানে অক্ষয়।

কিন্তু হায় তুমি দেখি আপনাতে আপনি বিভোর
তোমার উজ্জ্বল চোখ তোমারি সে রূপের দর্শক,
যেখানে প্রাচুর্য ঠিক সেইখানে কী দুর্ভিক্ষ ঘোর
তুমিই তোমার বৈরী দয়াহীন হে আত্মধর্ষক।

তুমি আজ পৃথিবীর অলঙ্কার সুন্দর শোভিত,
রঙ্গীন বসন্ত সে তো তোমাতেই আভাসিত রয়
আপন অঙ্কুরে তবু আপনারে রাখো আবরিত
কঞ্জুষ কুমার করো কার্পণ্যে নিজেকে বৃথা ক্ষয়।

পৃথিবীকে দয়া করো নহিলে এ লোলুপ সংসার
তোমার কবরে নেবে শোধ করে সব ঋণ তার।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

(৩২)

যদি তুমি বাঁচো, যবে আমি চিরপ্রশান্তির কোলে
হীন মৃত্যু অস্থি যবে ধুলি তলে ঢেকে দেবে,—ফের
অমার্জিত এই পদাবলী যদি পড়ো ভাগ্যবলে
লেখনী-প্রসূত যারা তোমারই গতায়ু প্রেমিকের।
সাধু নব কাব্যরীতি সাথে তার দিলেও তুলনা,
কালের গতিকে তার ঘটে যদি কোনো পরাজয়—
শ্রেয়তর কবিত্বের পাশে ম্লান হলেও, ভুলো না
প্রেমের খাতিরে সেই পদাবলী ; অন্য হেতু নয়।

আবার আমারে স্মরি মগ্ন হয়ো এ প্রিয় চিন্তায়—
—'যে বন্ধু রইলো বেঁচে, প্রতিভাও হতো বিকশিত,
সময়ের সাথে ; তার প্রেম মুঞ্জরিত কবিতায়
হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠতর কবিদের পাশে ঠাঁই দিত।
আসর জাঁকায় পটু নবীনেরা, সে নেইক যবে ;
এদের তারিফ করি, তাকে পড়ি প্রেমের গৌরবে।'

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

(৮১)

হয়তো বাঁচবো আমি স্মৃতিশিলা তোমার গড়াতে,
নয়তো তুমিই থাকবে, ধুলিতলে যাবো আমি মিশে ;
তোমার স্মৃতিকে মৃত্যু পারবে না আর কেড়ে নিতে,
যদিও আমার সত্তা বিস্মৃত হবে সব শেষে।

এখন তোমার নামে উপার্জিত অনন্ত জীবন,
একবার চলে গেলে মৃত বলে জানবে আমাকে,
আমাকে কি দিতে পারে, এই মাটি, সমাধি শয়ন
চিরোজ্জ্বল থাকবে তুমি, মানুষের অগণিত চোখে।

তোমার স্মরণচিহ্ন হবে কান্ত কবিতা আমার,
অনাগত মানুষেরা বারবার পড়বে কৌতূহলে,
উচ্চারিত হবে কণ্ঠে চিরকাল তোমার সত্তার
পৃথিবীর মানুষেরা মৃত হয়ে সব চলে গেলে।

তখনো বাঁচবে তুমি, এ কবিতা এত গুণ রাখে
উচ্ছ্বলিত শ্বাস বহে, এমনকি মানুষের মুখে।

কৃষ্ণ ধর

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব

১৯৬৩ সালে আমেরিকা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে আমাদের দেশে শেক্সপীয়র-চর্চার পরিপূর্ণ বিবরণী পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের শেক্সপীয়র-চর্চার তথ্যকে একত্রিত করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ডক্টর অমলেন্দু বসু সেদিন কোনো তথ্যই পাঠাতে পারেন নি। এই সামান্য ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে একটি অসামান্য বেদনাদায়ক সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত শেক্সপীয়র আমাদের জন-জীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। অথচ এই বিশেষ মূল্যবান ঘটনাটির সম্যক্ বিশ্লেষণ এতাবৎ স্পষ্টতই করা হয়নি। অবশ্য একেবারে কিছুই যে হয়নি তা নয়। কোনো কোনো নাটকের ইতিহাসে এই জাতীয় প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, এখানে ওখানে কখনো কখনো দু-চারটি প্রবন্ধও যে লেখা হয়নি তা নয়। কিন্তু শেষ বিচারে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, যা কিছু হয়েছে তা নিতান্তই সামান্য, ছড়ানো-ছিটানো ; এবং সর্বোপরি এই প্রচেষ্টাগুলিতে সব সময়েই পরিকল্পনার অভাব থেকে গেছে। মোটের ওপর এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ভাবটি মুগ্ধ-ভাব। গদগদ কণ্ঠে "Others abide our question, thou art free" আবৃত্তি করে, চোখ বন্ধ করে, মুগ্ধবৎ বসে থাকা বিপজ্জনক। বিশ্লেষণ না করে মুগ্ধ হয়ে থাকলে মোহের রসে পচন ধরে যেতে পারে একথাটি মনে রাখা উচিত।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় বাংলা নাটকের উপর শেক্সপীয়রের প্রভাব। বাংলা নাটকের সৃষ্টি ও প্রাথমিক পর্যায়ের বিবর্তনের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের নাটকগুলির রচনাকাল পর্যন্ত এদেশে নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে শেক্সপীয়র যে কত নিবিড়ভাবে জড়িত, তা অনুমান করা এই ১৯৬৪ সালের কোনো সাধারণ নাট্যরসিকের পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু

ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে দেখা যাবে যে বাংলা নাটকসৃষ্টির পিছনে বিশ্বজনীন নাট্যপ্রীতি ছাড়া বৃহত্তম ঘটনা বাংলাদেশে শেক্সপীয়র-চর্চা। কয়েকটি সুপরিচিত তথ্যের পুনরাবৃত্তি করলেই এই বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। আঠের শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে (Calcutta Theatre, Chandernagore Theatre, The Athenaeum Theatre, Dumdum Theatre, Baitokh-khana Theatre, Kidderpore Theatre, Chowringhee Theatre, Sans Souci Theatre, Hindoo Theatre) অভিনীত নাটকের অধিকাংশই শেক্সপীয়রীয় নাটক। লেবেদেফের থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করলে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের Hindoo Theatre-ই প্রথম বাঙালী পরিচালিত রঙ্গালয়। এটির শুরুও শেক্সপীয়র অভিনয় করে। ইংরাজী সাহিত্যে শিক্ষিত তৎকালীন ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও শেক্সপীয়র অভিনয়ের প্রবল ঔৎসুক্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। শেক্সপীয়র-চর্চা অভিনয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, এইচ. এইচ. উইলসন, আলেকজেণ্ডার ডাফ, প্রোফেসর কাওয়েল প্রভৃতি শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে শেক্সপীয়র পাঠের যে আগ্রহ সেদিন দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনেও তা ভোলা যায় না। শেক্সপীয়র অভিনয় এবং শেক্সপীয়র পাঠের এই পটভূমিকাতেই বাংলা নাটকের সৃষ্টি। অতিরঞ্জন দুষ্ট না হয়েও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, শেক্সপীয়রীয় প্রভাব সবিশেষ কার্যকর না হলে বাংলা নাটক সৃষ্টি সম্ভবত বিলম্বিত হত এবং তার চেহারাও নিশ্চিত অন্যরকম হত।

বাংলা নাটক সৃষ্টি যতটা শেক্সপীয়র প্রভাব-সঞ্জাত, তার প্রারম্ভিক বিবর্তনও সেই অনুপাতে শেক্সপীয়র-নির্ভর। বাংলা নাট্যসাধনার আদি ও মধ্যযুগের প্রধান নায়কবৃন্দ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের বিভিন্ন নাট্যপ্রয়াসে মহাকবি শেক্সপীয়রের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য নিয়েছেন। শুধু তাই নয়। সমকালীন অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখযোগ্য নাট্যকারবৃন্দ—কালীপদ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, উমেশ চন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ দাস, রাজকৃষ্ণ রায় ইত্যাদি—শেক্সপীয়রের কাছে অল্পাধিক ঋণী। এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বাংলা নাটকের প্রথম মৌলিক

রচনা 'কীর্তিবিলাসে'ও মহাকবির প্রভাব পরিদৃশ্যমান। 'কীর্তিবিলাসে' জি. সি. গুপ্ত সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরোধিতা করে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিকে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করে। এ ছাড়াও এই নাটকটিতে 'হ্যামলেট'-এর অনুকরণ-প্রচেষ্টা আছে, এবং নায়ক কীর্তিবিলাস 'হ্যামলেট' চরিত্রের ছায়ায় পরিকল্পিত।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য পদবাচ্য নাট্যকার মধুসূদন। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতার ফলে তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের দৈন্য স্বভাবতই তাঁর চোখে পড়ল। নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, সংস্কৃত নাট্যকলার বিধিনিষেধ বাংলা নাটককে বাড়তে দিচ্ছে না। স্বভাবতই তিনি অনুপ্রেরণার জন্য চোখ ফেরালেন পশ্চিমের দিকে এবং এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের স্থান পাকাপাকি হল। এর আগেও যে শেক্সপীয়র বাংলা নাটকে তাঁর প্রভাব ফেলেছেন তা আমরা 'কীর্তিবিলাস' থেকে জানতে পারি। কিন্তু মধুসূদনের নাটকেই শেক্সপীয়র সর্বপ্রথম সাহিত্যিক স্বীকৃতি পেলেন। অবশ্য একথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে, মধুসূদনের নাটকের সর্বত্র শেক্সপীয়রমনস্কতার ছাপ পরিদৃশ্যমান। শেক্সপীয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর নাটকে সামান্যই। কিন্তু পরোক্ষ বিচারে দেখা যাবে যে, মহাকবির কতকগুলি মৌলিক গুণ মধুসূদনের নাটকে কার্যকর হয়েছে। শেক্সপীয়রীয় চরিত্র-নির্ভর ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা, নাটকে শেক্সপীয়রীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার, ট্র্যাজিডিতে 'Comic' (কৌতুকরসের) যথাযোগ্য স্থান দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে মধুসূদন শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী।

মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটক রচনাকালে সংস্কৃত নাট্যরীতির অপ্রতুলতা সম্পর্কে সজাগ থাকা সত্ত্বেও এই নিষেধের বেড়া তিনি পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেন নি। 'শর্মিষ্ঠা'র পরবর্তী রচনা 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক দুটিও শেক্সপীয়র প্রভাবমুক্ত। এর পরের রচনা 'পদ্মাবতী' নাটকে প্রথম স্পষ্ট শেক্সপীয়রীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকটির কল্পবস্তু একটি গ্রীক Myth-এর পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণে পরিকল্পিত হলেও কলির স্বগতোক্তির মধ্যে শেক্সপীয়রীয় স্বগতোক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের পূর্বাপর বিশ্বাস ছিল যে, "No real improvement in the Bengali drama could be expected until blank verse was intrɔduced into it." সেই বিশ্বাসকে ফলপ্রসূ করার প্রথম চেষ্টা 'পদ্মাবতী' নাটকে কলির সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার।

'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক এবং সাহিত্যবিচারে (ঐতিহাসিক বিচারে নয়) বাংলা ভাষায় প্রথম ট্র্যাজেডি। 'কৃষ্ণকুমারী' রচনাকালে মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন এবং এই নাটকে শেক্সপীয়রীয় নাট্যশৈলীর বিভিন্ন দিক সাঙ্গীকরণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে বারবার শেক্সপীয়রের উল্লেখ চোখে পড়ে। তিনি নিজে বলেছিলেন যে 'কৃষ্ণকুমারী'-তে তিনি একটি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে চান। তাঁর সেই প্রচেষ্টার ছাপ এই নাটকটির বহু অংশে স্বপ্রকাশ। আলোচ্য নাটকটির ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়র-ধর্মী। চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও মহাকবির প্রভাব সুস্পষ্ট। ভীমসিংহ চরিত্রটির অংশবিশেষ—তার কন্যাশোকে উন্মত্ততা—লীয়র চরিত্রের অনুবর্তী। রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রটি মূলতঃ 'কিং-জন্'-এর জারজ ফিলিপ্-এর চরিত্র অনুকরণে পরিকল্পিত। মধুসূদন স্বয়ং এই ঋণের কথা তাঁর একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। এই নাটকে শেক্সপীয়রের কাছে মধুসূদনের ঋণ পূর্বোল্লিখিত ক্ষেত্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ নয়। মদনিকার পুরুষের ছদ্মবেশ গ্রহণ শেক্সপীয়রীয় নারী চরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণের মতো কৌশলের অনুকৃতি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, এই সময়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এলিজাবেথীয় যুগের মতো পুরুষেরাই মহিলার ভূমিকা অভিনয় করত। ফলত পূর্বোক্ত শেক্সপীয়রীয় কৌশলটি কাজে লাগানো মধুসূদনের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত হয়েছিল। সর্বোপরি, ট্র্যাজেডি রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন যে ধ্রুপদী নাট্যরীতির চেয়ে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির অনুগামী ছিলেন তা বোঝা যায় 'কৃষ্ণকুমারীতে' কৌতুকের ব্যবহারে। মধুসূদন বিশ্বাস করতেন যে: "The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy." তাঁর একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছেন, "Never strive to be comic in a tragedy, but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to make an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan." এই ধারণাকে মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারীতে'

অল্পাধিক কার্যকর করেছিলেন। মদনিকার রঙ্গপ্রিয়তা এবং চপলতা একদিকে বৈচিত্র্য আনে, অপরদিকে কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডিকে তীব্রতর করে তোলে। পরিশেষে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কোনো শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে বিষাদের চরম মুহূর্তে যবনিকা পড়ে না। নাটক শেষ হওয়ার আগে ট্র্যাজেডির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম জড়িত কোনো চরিত্রকে দিয়ে শেক্সপীয়র কতকগুলি কথা বলান যার ফলে দর্শকেরা ট্র্যাজিকবৃত্ত থেকে মোটামুটি বাস্তব জগতের সংস্পর্শে ফিরে আসতে পারে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন এই রীতির অনুসরণ করেছেন। মন্ত্রী সত্য দাসের বিবেচনাপূর্ণ সমাপ্তি-সংলাপ ("রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাক্‌গে। এদিকের তো সকলি শেষ হল। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আসুন, রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।" [যবনিকা পতন] উদয়পুরের ট্র্যাজিক জগৎ এবং আমাদের প্রাত্যহিক জগৎ—এই দুয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ।

মধুসূদনের শেষ নাটক 'মায়াকানন' রচনাকালে তাঁর প্রতিভা স্তিমিত-মনস্ক। এই নাটকটিতেও শেক্সপীয়রের সামান্য প্রভাব লক্ষণীয়। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে মৃত মহারাজার আত্মার আবির্ভাব হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব-দৃশ্য বা ব্যাঙ্কোর আত্মার আবির্ভাব-দৃশ্যের কথা স্মরণ করায়।

মাইকেল মধুসূদন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রথম নাট্যকার যাঁর নাটক সাহিত্যপদবাচ্য। কিন্তু মঞ্চসফল নাট্যকার বলতে যা বোঝায়, মধুসূদন তা নন। দীনবন্ধু মিত্রই যথার্থ বাংলা নাটককে অভিজাতদের বাগানবাড়ি থেকে জনসাধারণের আঙিনায় হাজির করলেন। বাংলা মঞ্চেরও শুরু দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় করে। তাঁর 'নীলদর্পণ' শতাধিক বছর পূর্বে জনমনে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, পরিবর্তিত পটভূমিকা সত্ত্বেও আজকের দর্শকের মনে তা অপরিম্লান। বাংলা নাটকের আদিযুগের এই অসামান্য প্রতিভাবান নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটকেও শেক্সপীয়রের প্রভাব অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়। দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে শেক্সপীয়রের সঙ্গে, তাঁর সবিশেষ পরিচয় ছিল। শেক্সপীয়রের নাটক যে তিনি কত আন্তরিকতার সঙ্গে পড়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর বিভিন্ন নাটকের চরিত্রের সংলাপের যত্রতত্র শেক্সপীয়রের উদ্ধৃতি বাহুল্যে। কিন্তু মহাকবির

সঙ্গে এই সুগভীর পরিচিতি সত্ত্বেও দীনবন্ধুর নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব ঠিক সেই ধরনের নয় যেমনটি আমরা দেখি মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'তে বা গিরিশ-চন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'-এ বা দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান'-এ। শেক্সপীয়রীয় প্রভাব দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে গুণগত নয়, তাঁর নাট্যশৈলী একান্ত নিজস্ব। মহাকবির প্রভাব তাঁর নাটকে সব সময়েই বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা বা সিচুয়েশন বা সংলাপ বা কোনো theatrical convention-এর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এবং এই জাতীয় প্রভাব দীনবন্ধুর বেশ কয়েকটি নাটকেই অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী'তে শেক্সপীয়রের *Merry Wives of Windsor* নাটকটির প্রভাব সবিশেষ সক্রিয়। 'জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা মালতী' episode-টি ঘটনা ও চরিত্র-পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রায় পুরোপুরি শেক্সপীয়র-নির্ভর। জলধর চরিত্রটি Falstaff-এর ছায়ায় রচিত, Falstaff-এর মতো সেও নিজের রূপগুণ ও রসিকতায় নিজেই বিভোর। মল্লিকা ও মালতী Mrs. Ford এবং Mrs. Page-এর মতোই witty এবং রসিকা। চরিত্রগত সাদৃশ্যের চেয়ে ঘটনাগত সাদৃশ্য কোনো অংশে কম নয়। জলধর তার প্রণয়াধিক্যের জন্য Falstaff-এর মতোই দু'বার নিগৃহীত হয় এবং সেই নিগ্রহও একই ধরনের। জলধর-নিগ্রহের ব্যাপারে মল্লিকা ও মালতীর ভূমিকা Mrs. Ford ও Mrs. Page-এর ভূমিকারই অনুভূতি। আবার শেক্সপীয়রের নাটকের Mr. Ford-এর মতোই রতিকান্তও স্ত্রীর সতীত্বে অনর্থক সন্দেহ করে একই ভাবে বোকা প্রতিপন্ন হচ্ছে। সর্বোপরি, কোনো কোনো জায়গায় সংলাপের সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে "কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করলে, কমলিনীর সৌন্দর্য-সৌগন্ধের অন্যথা হয় না" *Romeo and Juliet*-এর স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতে "The Rose, call it by any name, would smell as sweet" লাইনগুলির ভাষান্তর মাত্র। অবশ্য সংলাপগত এই সাদৃশ্য খুবই কম। পুরো episode-টির মধ্যে Fairy-রা অনুপস্থিত এবং জগদম্বা চরিত্রটি মৌলিক সৃষ্টি।

'লীলাবতী' নাটকেও শেক্সপীয়রের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন প্রভাব চোখে পড়ে। ললিত-লীলাবতীর প্রণয়দৃশ্যটি সম্ভবতঃ *Romeo and Juliet*-এর ছায়ায় পরিকল্পিত। অবশ্য এই সাদৃশ্য নিতান্তই বহিরঙ্গ, কারণ শেক্সপীয়রের প্রণয়দৃশ্যটিতে যে আবেগ এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধ আছে, বাংলা নাটকটিতে তা

নেই বললেও চলে। ফলত ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ নিছক বাগাড়ম্বরের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। আলোচ্য নাটকে শেক্সপীয়রের কাছে দীনবন্ধুর ঋণ একটি ঘটনা-সংস্থাপনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকবির বহু ব্যবহৃত sex-concealment device-এর অনুকরণেই দীনবন্ধু চাঁপাকে সন্ন্যাসী, অরবিন্দ ইত্যাদি সাজিয়েছেন।

'সধবার একাদশী' নাটকের প্রধান চরিত্র নিমে দত্তকে কথনো কথনো Falstaff-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। নিমে দত্ত চরিত্রটির ট্র্যাজিক পরিণতি বা তার তীব্রতা হয়তো বা শেক্সপীয়র প্রভাবপুষ্ট হতে পারে; কিন্তু Falstaff-এর সঙ্গে তার সাদৃশ্য নিতান্তই কষ্টকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকটিতে নিমে দত্তর সংলাপে মহাকবির নাটক থেকে কিছু উদ্ধৃতির ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অনুসন্ধান করতে গেলে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

'কমলে-কামিনী' নাটকটিতে দীনবন্ধু *Macbeth*-এর কয়েকটি লাইন motto রূপে ব্যবহার করেছেন (Duncan-dismay'd not this/Our Captains, Macbeth and Banquo ?/Sergeant—Yes ;/As sparrows eagles, or the hare the lion.)। এর থেকে পাঠকের ধারণা করা স্বাভাবিক যে, দীনবন্ধু এই নাটকটিকে বীররসাত্মক করতে চেয়েছিলেন, শিখণ্ডীবাহনের বীর্যের সঙ্গে Macbeth বা Banquo-র বীরত্বের সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছিলেন। হয়তো তাই, কিন্তু পাঠকের সেই আশা নাটকটি পূর্ণ করতে পারে নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকের আদিপর্বের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয়ের কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রূপান্তর ও অনুবাদের মাধ্যমে বাঙ্গালী পাঠক বিভিন্ন দেশের ও ভাষার সাহিত্যরত্নের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাবলীতে ফরাসী বা সংস্কৃত সাহিত্যের যত বেশি স্থান, সে তুলনায় ইংরাজী সাহিত্যের, বিশেষত শেক্সপীয়রের স্থান নিতান্তই স্বল্প। তবুও উনিশ-শতকী সাহিত্যের যে সাধারণ শেক্সপীয়রমনস্কতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। শেক্সপীয়র অনুবাদের যে ধারাটি স্তিমিতপ্রায় হয়ে এসেছিল, ১৯০৭ সালে *Julius Caesar* অনুবাদ করে তিনি সেটিকে আবার বেগবতী করে তুললেন। শেক্সপীয়রের অনুবাদ ছাড়া তাঁর মৌলিক নাটকেও মহাকবির প্রভাব অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকটির দুটি প্রধান চরিত্র এবং ঘটনার পরিণতি শেক্সপীয়র-প্রভাবপুষ্ট। সেলিম চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্বে Othello-র অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা স্মরণে আসে। Othello-র মতো তার মনেও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন, Othello-র মতোই সে ঈর্ষার জালায় নিজের প্রণয়িনীকে হত্যার চেষ্টা করেছে এবং পরে নিজে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। আলোচ্য নাটকেই ফরিদ চরিত্রটি Iago-র ছায়ায় রচিত। Iago-র মতো ফরিদের কুটিলতাই নাটকটিকে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। 'অশ্রুমতী'র পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মানময়ী' নামে একটি ছোট গীতিনাট্য লেখেন। উনিশ বছর পরে এই নাটকটিই পুনর্লিখিত হয়ে 'পুনর্বসন্ত' নামে প্রকাশিত হয়। 'পুনর্বসন্ত'-এর স্বল্প কাহিনী শেক্সপীয়রের *A Midsummer Night's Dream*-এর ছায়ায় পরিকল্পিত।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত নামগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান সকলের উর্ধ্বে। তিনি বাংলা নাটকের আদিযুগ ও মধ্যযুগ উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ; কাজেই তাঁর নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব কতটা কার্যকর হয়েছে তা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। গিরিশচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁর কথায় এবং কাজে শেক্সপীয়রের অনুগামী। তিনি নিজেই বলেছেন, "মহাকবি শেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।" ছেলেবেলা থেকেই গিরিশচন্দ্রের শেক্সপীয়রে প্রবল আগ্রহ। শেক্সপীয়রের নাটক তিনি যেমন পড়েছিলেন এবং আয়ত্ত করেছিলেন, তৎকালীন কোনো দেশীয় অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ বোধহয় তা করেন নি। মহাকবির সঙ্গে বাল্যাবধি গড়ে-ওঠা এই সুগভীর পরিণিতির ছাপ গিরিশ নাট্যাবলীর সর্বত্র স্বপ্রকাশ। তাঁর নাটকের ভাষা, ঘটনা-সংস্থাপনা ও প্লট, আংশিক বা সামগ্রিক চরিত্র-পরিকল্পনা, বিভিন্ন theatrical convention-এর ব্যবহার, এমনকি কথনো কথনো ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও শেক্সপীয়রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রথমেই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন গৈরিশি ভাষা। গিরিশচন্দ্রের ভাষা বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর স্মরণযোগ্য দান। যেখানে যে-ভাষা যেমন ভাবে প্রযোজ্য, সেখানে তিনি সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী। Macbeth বা King Henry কাব্যিক সংলাপে নিজেদের ভাব প্রকাশ করে, Porter বা Falstaff কথা বলে গদ্যে।

গিরিশচন্দ্রও, তাঁর সংলাপের ক্ষেত্রে অল্পাধিক এই রীতিরই অনুবর্তী। তাঁর 'জনা' নাটকে একই দৃশ্যে বিদূষক গদ্যে ও জনা পদ্যে ভাব প্রকাশ করে। আবার শেক্সপীয়রের মতো গিরিশচন্দ্রও হাল্কা ও হাস্যরসাত্মক ভাব প্রকাশের জন্য পদ্য ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি, গৈরিশিছন্দ শেক্সপীয়রীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে পৃথক হলেও তার সৃষ্টি একই অনুপ্রেরণা-সঞ্জাত। উভয়েরই উদ্দেশ্য মূলত অভিন্ন: ভাষাতে সর্বাত্মক নাটকীয়তা আরোপ করা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবানুভূতির বাহন করে তোলা।

শেক্সপীয়রের কাছে হলিনশেড বা প্লুটার্চ বা সিন্থিও যা ছিল, গিরিশের কাছে শেক্সপীয়রও বহুলাংশে প্রায় তাই ছিলেন। শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের ছায়া অবলম্বনে তাঁর কয়েকটি নাটক রচিত। পারস্য উপন্যাসকে ভিত্তি করে রচিত মিলনান্ত নাটক 'মনের মতন'-এর শেষদিকটি *As you Like It*-এর ছাঁচে গড়া। 'স্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্যখানিও পরিবেশ-পরিকল্পনায় *A Midsummer Night's Dream*-এর কাছে ঋণী। এ ছাড়া শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাট্যাংশ তো গিরিশচন্দ্র নিজের প্রয়োজনমতো যথেচ্ছ কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর বহু চরিত্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় চরিত্রাবলীর অবস্থাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। Caesar-এর মৃত্যুর পর তার 'spirit'-এর মতো 'চণ্ড' নাটকে রঘুদেবজীও মৃত্যুর পরে অন্যান্য সব কটি চরিত্রকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে। 'জনা' নাটকের কোনো কোনো স্থানে *Coriolanus*-এর প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। জনা যখন পুত্রবধূ মদনমঞ্জরীকে বীরজায়ার কঠোর কর্তব্য বোঝাচ্ছে স্বামীর অকল্যাণে আশঙ্কিতা পুত্রবধুকে উৎসাহিত করছে ("ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ", "উচ্চকার্যে স্বামীকে উৎসাহ কর দান" বা "এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হতে?") তখন স্মরণে আসে *Coriolanus*-এর সেই দৃশ্যটি যেখানে Volumnia বিচলিতা পুত্রবধূ Vergilia-কে বলছে, "Away, you fool! It more becomes a man/Than gilt his trophy. The brearsts of Hecuba,/when she did suckle Hector, look'd not lovelier/Than Hector's forehead when it spit forth blood/At Grecian sword, contemning.

'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকটি পড়লে *Richard II*-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য উপেক্ষা করা যায় না। দুটি নাটকেই নিরীহ রাজা বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় বা বন্ধুবর্গের ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত ও নিহত। কখনো কখনো সিরাজের সংলাপে Richard-

এর কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। Richard-এর আক্ষেপ: "O that I were a mockery king of show" সিরাজের আর্তি: "প্রিয়ে ফুরায়েছে রাজ অভিনয়" থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। 'মিরকাশিম' নাটকেও এই আংশিক অবস্থাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মিরকাশিম-বেগম যখন নবাবকে বলছে, "আমি তোমার পত্নী, তুমি আমাকে বিলাসিনী রমণীজ্ঞানে উপেক্ষা করো না", তখন মনে পড়ে *Julius Caeser*-এর সেই দৃশ্যটি যেখানে Portia Brutus-কে বলছে, "I grant I am a woman but withal, A woman that Lord Brutus took to wife." 'পূর্ণচন্দ্র' এবং 'বাসর' নাটকেও দুটি একই ধরনের হাসির ঘটনার উৎস *Merry Wives of Windsor.* প্রথম নাটকে যখন শারি ও সুন্দরা দামোদরকে বাঁদর সাজাচ্ছে বা দ্বিতীয় নাটকটিতে বিম্বাবতীর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে জগন্নাথ যখন রান্নাঘরে আটকা পড়ছে, তখন আমাদের স্মরণে আসে Mrs. Page-এর হাতে Falstaff-এর বেকুব বনার দৃশ্যটি। 'বিষাদ' নাটকের টুকরো টুকরো ঘটনা শেক্সপীয়রের ছায়া অবলম্বনে রচিত। রাজরাণী সরস্বতীর বালকবেশে বেশ্যাসক্ত স্বামীকে সেবা করা *The Two Gentlemen of Verona*-র Julia-র প্রেমাস্পদ Proteus-এর দাস্যবৃত্তির সঙ্গে তুলনীয়। ঐ একই নাটকে অলর্ককে প্রলুব্ধ করার জন্য ময়ূরপঙ্খী বজরায় রূপবতী উজ্জলার গীতলহরী Enobarbus বর্ণিত Cydnus নদীতে Cleopatra-র কথা স্মরণ করায়। এমনি উদাহরণ আরও বহু পাওয়া যাবে গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের চরিত্রাবলী তাঁর ঘটনা-সমূহের চেয়ে কম, শেক্সপীয়র-প্রভাবপুষ্ট নয়। কয়েকটি শেক্সপীয়রীয় 'type' চরিত্র গিরিশচন্দ্রকে সবিশেষ প্রভাবিত করেছে। শেক্সপীয়রের Fool বা Clown শ্রেণীর চরিত্রের ছাঁচে গড়া এক শ্রেণীর ভাঁড়-জাতীয় চরিত্র গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকেই চোখে পড়ে। 'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র বাতুল, 'অশোক'-এর আকাল, 'জনা'-র বিদূষক, 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর কঞ্চুকী, 'চণ্ড' নাটকের পূর্ণরাম ভাট, 'সিরাজুদ্দৌলা'-র করিমচাচা প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র। Fool-এর পরেই গিরীশচন্দ্রের সর্বাধিক প্রিয় চরিত্র সম্ভবত Falstaff. 'মুকুলচাঁদ' নাটকের বরুণচাঁদ চরিত্রটি Falstaff-এর মতোই; সে নিজে না হেসে পরকে হাসায়, বাক্‌পটু এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। এই ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী Indian Sir John Falstaff নামে অভিহিত হতেন। 'মোহিনী-প্রতিমা'-র জম্বুভয়

এবং 'পূর্ণচন্দ্র'-এর দামোদর চরিত্র দুটিও Falstaff-এর ছায়া অবলম্বনে সৃষ্ট। এ ছাড়াও তাঁর বহু চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের কাছে পুরোপুরি না হলেও আংশিক ঋণী। তাঁর প্রথম নাটক 'আনন্দ রহো'-তে লীলার চরিত্রে Lady Macbeth-এর ছায়া পড়েছে। 'বৈষ্ণবী' নাটকের গুলনানাও শেক্সপীয়র-নির্ভর চরিত্র। জনা চরিত্রের উপর একই সঙ্গে বিভিন্ন শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। *Richard III* নাটকে স্বামীপুত্রের হত্যার প্রতিশোধ মানসে Queen Margaret-এর যে ভীষণ রূপ, তার সঙ্গে জনা চরিত্রের ভীষণতার সবিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার যেখানে জনা পুত্রবধুকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াসী, সেখানে *Coriolanus*-এর Volumnia-র কথা স্মরণে আসে, 'সিরাজুদ্দৌলা'-র জহরা চরিত্রেও Queen Margaret-এর স্বল্প ছাপ চোখে পড়ে। ঐ একই নাটকে সিরাজ-পত্নী লুৎফ্‌উন্নেসার সঙ্গে *Henry IV*-এর Lady Percy-র মিল অতিসামান্য হলেও দৃষ্টি এড়ায় না।

শেক্সপীয়রের কাছে গিরিশচন্দ্রের ঋণ চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকবির একাধিক নাটকীয় কৌশল গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটকে অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিষাদ' নাটকে রাজরাণী সরস্বতীর বালকবেশে অলর্ক ও উজ্জ্বলার দাস্যবৃত্তি গ্রহণ, 'রূপ-সনাতন' নাটকে অলকার কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী সাজা, 'মায়াবসান' নাটকে যাদব ও মাধবের স্ত্রীদের পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় sex-concealment device দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিভিন্ন নাটকে প্রেতাত্মার অবতারণা শেক্সপীয়রের প্রভাবজাত। 'বিষাদ' নাটকটিতে রাজমাতা ও সরস্বতীর ছায়া-মূর্তির আবির্ভাব *Hamlet*-এর অনুকৃতি। 'চণ্ড', 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি নাটকও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

কিন্তু এ পর্যন্ত আলোচিত সাদৃশ্য নিতান্তই বহিরঙ্গ। গৈরিশ নাটকে যে শেক্সপীয়রের মতো ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, প্রতিহিংসা, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতির ছড়াছড়ি তাও নিঃসন্দেহে বহিরাশ্রয়ী মিলের পর্যায়ভুক্ত। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রের প্রকৃত মিল উভয়ের ট্র্যাজেডির সমধর্মিতায়। মহাকবির কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় ঋণ ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব—internal dramatic actions—যা সামান্য ভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই internal dramatic actions এঁকে দেখানোই best literary art।" এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা গিরিশচন্দ্রের মতে শ্রেষ্ঠ

নাটকীয় সম্পদ—শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির প্রাণবস্তুস্বরূপ এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বই গিরিশচন্দ্রের সার্থক নাটকের—সংখ্যায় যদিও তা নিতান্তই স্বল্প—প্রকৃত শক্তি। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটি অনেকের মতে গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। তার কারণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে গিরিশচন্দ্র এই নাটকটিতে বহুলাংশে সার্থকভাবে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির সাঙ্গীকরণ করতে পেরেছেন। চরিত্রগুলির বিকাশ প্রধানত মনস্তত্ত্বসম্মত; নাট্যশৈলী মূলত সংলাপ-নির্ভর এবং চরিত্র-বিকাশী। 'জনা' বা 'প্রফুল্ল'-ও এই প্রসঙ্গে অল্পাধিক স্মরণযোগ্য। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই নাটকগুলি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির সমধর্মী, সমকক্ষ নয়।

গিরিশপ্রসঙ্গে পরিশেষে আরো দুই-একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রের কাছে সবিশেষ ঋণী। কিন্তু তাঁর ঋণ অনুকরণমাত্র নয়। নিছক অনুকরণ craftsman-এরই শোভা পায়, তা কখনোই শিল্পী-জনোচিত নয়। তার থেকেও বড় কথা, গিরিশচন্দ্রের পক্ষে শুধুমাত্র অনুকারী হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। শেক্সপীয়রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। জাতীয় ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল গভীরতর। শেক্সপীয়রীয় তথা রেনেসাঁস জীবনদর্শন এবং ধর্মময়তায় আপ্লুত খাঁটি বাঙ্গালী দৃষ্টিভঙ্গির মাঝখানে যে বিপুল ব্যবধান তা অতিক্রম করা গিরিশচন্দ্রের কাম্য ছিল না, সাধ্যও ছিল না। ফলত কখনো বা একই নাটকে দুটি ধারা স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো আবার দুয়ে মিলিয়ে ঘটিয়েছে রসাভাস। তাহলে কি এই কথাই মেনে নিতে হবে যে, গিরিশচন্দ্রের উপরে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয়েছে? একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকই অভিনীত হতে দেখলে বা পড়তে গেলে সেগুলিতে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অল্পাধিক বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই প্রভাব নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকের পুষ্টিসাধন করেছে। গৈরিশ যুগের প্রারম্ভে বাংলা নাটকের যে অবস্থা ছিল, গিরিশচন্দ্রের পরে বাংলা নাটকে তার থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতিটুকুই গিরিশচন্দ্রের শেক্সপীয়রমনস্কতার ফলশ্রুতি। গিরিশচন্দ্র অক্লেশে এবং অকুণ্ঠায় শেক্সপীয়রের ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ না করলে বাংলা নাটকের ইতিহাস অন্যরকম রচিত হত।

গিরিশচন্দ্রের পরেই সমকালজ নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলাল বসুর

স্থান সর্বাগ্রগণ্য। বিদেশী নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষত শেক্সপীয়রের সঙ্গে, অমৃতলালের যোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। এ সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে (কারণগুলি বর্তমান বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হওয়ার অসুবিধা আছে) তাঁর নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব নিতান্তই স্বল্প। পারতপক্ষে অমৃতলাল শেক্সপীয়রের অনুকরণ বা অনুসরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছেন।

অমৃতলালের 'রাজাবাহাদুর' নাটকটিতে সামান্য হলেও শেক্সপীয়রের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই নাটকের একটি জায়গায় চরিত্র পরিকল্পনা ও ঘটনা-পরিকল্পনা *Taming of the Shrew* নাটকটির অনুকৃতি। ঘটনাগত ভাবেও উভয় নাটকের মধ্যে যে বিরাট সাদৃশ্য *Tamiug of the Shrew*-এর Introduction-এর প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যটির পাশাপাশি 'রাজাবাহাদুর'-এর তৃতীয় দৃশ্যটি পড়লেই উপলব্ধি করা যায়। অমৃতলালের 'কৃপণের ধন' প্রহসনটি মূলত মলিয়েরের *The Miser*-এর অনুকৃতি হলেও এতে মন্মথ ও কুন্তলার প্রণয়াখ্যানটি সম্ভবত *The Merchant of Venice*-এর Jessica-Lorenzo প্রণয়বৃত্তান্তটির অনুপ্রেরণাসঞ্জাত।

বাংলা নাটকের মধ্যযুগের সার্থকতম নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর শেক্সপীয়রের প্রতি বাল্যাবধি-গড়ে-ওঠা অনুরাগ ইংলণ্ডবাসের ফলে তীব্রতর হয়েছিল। মহাকবির সমাধির সামনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শেক্সপীয়রকে কালিদাসের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই প্রতিজ্ঞা-রক্ষার ছাপ তাঁর নাট্য-সাধনার সর্বস্তরে স্বপ্রকাশ। তাঁর নাটকের ভাষা, ঘটনা-সংস্থাপনা, আংশিক বা সামগ্রিক চরিত্র পরিকল্পনা, মায় ট্র্যাজেডি পরিকল্পনাতেও শেক্সপীয়রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লেখা শুরু করেন শেক্সপীয়রের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। 'তারাবাঈ' প্রকাশিত হবার পর নবীনচন্দ্র তাঁকে গদ্যে নাটক রচনার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শের ফলে এবং নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী এখন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যে লেখা শুরু করলেন। কিন্তু পরবর্তী নাটকসমূহের বহু অংশেই তাঁর গদ্য কাব্যাশ্রয়ী (যেমন 'সাজাহান' নাটকের ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে সাজাহানের স্বগতোক্তি)। অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যের এই কাব্যময়তার উৎস সম্ভবত শেক্সপীয়রীয় ভাষা নিয়ে তাঁর প্রথম দিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ভাষার ব্যাপার ছাড়া বিভিন্ন ঘটনা-সংস্থাপনার ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী। 'ভীষ্ম' নাটকের শান্তনু-সত্যবতীর দৃশ্যটি (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) নিঃসন্দেহে *Richard III*-এর ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্যের প্রভাবে রচিত। 'তারাবাঈ' নাটকের সূর্যমল ও তমসার কাহিনী *Macbeth* নাটকের অনুসরণে পরিকল্পিত। Macbeth-এর Duncan-প্রীতির মতো সূর্যমলের চরিত্রেও রয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য বাৎসল্য। আবার Macbeth-এর মতোই সূর্যমল রাজ্যলোভকে অস্বীকার করতে পারছে না। এই উচ্চাশাকে Witch-দের মতো চারণীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছে। আবার সূর্যমল-পত্নী তমসা যখন স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কার্যকর করে তোলার প্ররোচনায় প্রয়াসী, তখন আমাদের Lady Macbeth-এর কথা মনে পড়ে যায়। 'নূরজাহান' নাটকের লায়লা চরিত্রের সঙ্গে 'Hamlet' নাটকের নায়কের অবস্থাগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। পিতৃহন্তাকে যে তার মা বিবাহ করেছে Hamlet-এর মতো লায়লার কাছেও তা অসহ্য। Hamlet-এর মতোই সে তার মাকে সমালোচনা করেছে এবং পিতৃহন্তাকে ধ্বংস করার শপথ নিয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে পরবর্তী কালের লায়লা—যার নারীত্ব অন্য সবকিছুর উপরে—Hamlet-এর থেকে অনেক পৃথক এবং দুর্বল।

ভাষা বা ঘটনা-সংস্থাপনার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্র-নাটকের চরিত্রাবলী অধিকতর শেক্সপীয়র-প্রভাবপুষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাধিক প্রিয় Lear চরিত্রের ছায়া তাঁর বহু চরিত্রেই লক্ষণীয়। 'মেবারপতন'-এর গোবিন্দসিংহ, 'সিংহল-বিজয়'-এর সিংহবাহু এবং 'পরপার'-এর বিশ্বেশ্বর প্রমুখ চরিত্রের সঙ্গে Lear-এর অল্পবিস্তর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। Lear-এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল-এর ঋণ Hamlet-এর কাছে। Hamlet-এর প্রভাব লায়লা চরিত্র ছাড়া 'সিংহল-বিজয়' নাটকের কুবেণী চরিত্রের উপরেও পড়েছে। সূর্যমল, তমসা প্রভৃতি চরিত্রের উপর অন্যান্য শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের প্রভাবের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই মহাকবির সাহায্য নিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে সমধর্মী চরিত্রের মুখে শেক্সপীয়রের চরিত্রের সংলাপের প্রায় বঙ্গানুবাদ জুড়ে দিতেও ইতস্তত করেন নি। তাই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অপমানিতা মুরাকে যখন বলতে শুনি: "শূদ্রাণী! শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ

নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই?" তখন Shylock-এর অনুরূপ সংলাপ স্মরণে আসে: "I am a Jew. Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?" চরিত্র পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা আংশিক ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল-সৃষ্ট কয়েকটি প্রধান চরিত্র আগাগোড়া কয়েকটি বিখ্যাত শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। দিলদার, সম্রাট সাজাহান ও নূরজাহান পুরোপুরি শেক্সপীয়র-নির্ভর চরিত্র। দিলদারের সঙ্গে *King Lear*-এর Fool-এর মিল বড় অল্প নয়। এমন কি কখনো কখনো দিলদারের সংলাপ শেক্সপীয়রের ভাবান্তর মাত্র। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল শেষরক্ষা করতে পারেন নি। সাজাহান চরিত্রের পরিকল্পনা—তার অবস্থাগত সাদৃশ্য, নিদারুণ ট্র্যাজেডির সামনে নিষ্ক্রিয়তা, উন্মাদ হয়ে নিজের অভিশাপ উদ্দাম প্রকৃতির মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া—এ সবই Lear-এর চরিত্রানুসরণে পরিকল্পিত। 'সাজাহান' নাটকের ৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য তো *King Lear*-এর Storm scene-এরই ভাবানুবাদ। সাজাহানের নিষ্ফল চিৎকার: "মেঘ! বারবার কি নিষ্ফল গর্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পার?"—Storm scene-এ লীয়ারের আর্তিরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রভাব সাজাহান বা দিলদারের থেকে নূরজাহান চরিত্রে বেশি সার্থক হয়েছে। শেক্সপীয়র যে ধাতুতে Lady Macbeth-কে গড়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ধাতুতেই নূরজাহানকে গড়েছেন।

এসব ছাড়া শেক্সপীয়রের বহুবিধ নাটকীয় কৌশল দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিভিন্ন নাটকে অসঙ্কোচে লাগিয়েছেন। 'সিংহল-বিজয়' নাটকে লীলার বালকের ছদ্মবেশ গ্রহণ শেক্সপীয়রীয় sex-concealment device-এর অনুসৃতি। 'সাজাহান' নাটকের ৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে ঔরংজীবের hallucination-এর সঙ্গে *Macbeth* নাটকের Banquet scene-এর সাদৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সর্বোপরি নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার নতুন না হলেও একে এত নাটকীয় ভাবে ব্যবহার করা দ্বিজেন্দ্রলালেই প্রথম। তাঁর নাটকে গান সংলাপের কাজ করে, নিছক গানই থাকে না। এ ব্যাপারেও দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়র-প্রভাবিত বললে তা নিছক কষ্টকল্পনা হবে না।

এতাবৎ দ্বিজেন্দ্র-নাটকে শেক্সপীয়রীয় নাটকের যে প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি তা নিতান্তই বহিরাশ্রয়ী। দু-জনের মধ্যে প্রকৃত মিল উভয়ের

ট্র্যাজেডির সমধর্মিতায়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বলেছেন: "অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকেই দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।" এবং তাঁর নাট্যসাধনার শুরু থেকেই এই বিশেষ গুণটি আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। 'তারাবাঈ' নাটকে সূর্যমল-তমসার কাহিনী শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির তারে বাঁধা। অবশ্য মাঝপথেই সূর্যমল চরিত্রটি অতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তমসা অতি-নাটকীয়তার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তি অনেক বেশি সংহত হয়ে ওঠে। এই সময় রচিত 'সাজাহান' নাটকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক রীতির প্রয়োগ সার্থকতর এবং অধিকতর শিল্পসম্মত। 'নূরজাহান' নাটকে ঘটে তাঁর শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। গতিবেগের তীব্রতা ও অনিবার্যতা, সার্থক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনায় 'নূরজাহান' বাংলাদেশে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির প্রথম সার্থক রূপায়ণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে সবশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অধিকাংশ নাট্যকারের রচনায় ভারমাত্র; দ্বিজেন্দ্রলাল এ ব্যাপারে আর সকলের চেয়ে প্রয়োগসিদ্ধ। তাঁর শেক্সপীয়র-মনস্কতা কোনো মতেই শুধুমাত্র নকলনবিশী নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব সামান্য হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। তাঁর 'পলিন' নাটকের বিষয়বস্তু পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে নায়িকার ভ্রমোৎপাদন। এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় disguise-convention-এর অনুপ্রেরণাজাত। তাঁর 'রক্ষঃরমণী' নাটিকাটিতে *Tempest*-এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়, বিশেষত সর্বাণীর চরিত্রের ও সিচুয়েশনের সঙ্গে Miranda-র চরিত্র ও অবস্থার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। অনেকের মতে অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা 'নর-নারায়ণ' শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক রীতির অনুগামী। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হতে পারে, কিন্তু এই নাটকে তিনি কতটা শেক্সপীয়র-অনুগামী তা প্রমাণসাপেক্ষ।

সবশেষে যাঁর নাটকে আমরা শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অনুসন্ধান করব তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই তুলনামূলক আলোচনায় কেউ কেউ হয়তো কুঞ্চিতনাসা হয়ে মনে করতে পারেন যে, এতে রবীন্দ্রনাথের অসম্মান করা হয়। তার উত্তরে আমরা এইটুকুই বলব যে Ibsen যদি Scribe-এর

সাহায্য নিয়ে Ibsen থাকতে পারেন, Shaw যদি Robertson-Pinero-র সাহায্য নিয়েও Shaw থাকতে পারেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কেন শেক্সপীয়রের সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারবেন না? প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু যে কোনো মহৎ শিল্পীর মতোই tradition-নির্ভর। সেই traditional (এখানে traditional শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না) বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যাস-বাল্মিকীর যেমন স্থান, Donne-Shelley-র যেমন স্থান, শেক্সপীয়রেরও ততটুকুই স্থান। রবীন্দ্রনাথের tradition সমগ্র বিশ্বসাহিত্য-নির্ভর।

কবিগুরুর প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব নানা ভাবে কার্যকর। কখনো বা তিনি শেক্সপীয়রীয় sex-concealment device-এর অনুসরণে শৈলবালাকে পুরুষের ছদ্মবেশ পরিয়েছেন। কখনো বা সাধারণ লোকেদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শেক্সপীয়রের Mob-এর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর কোনো কোনো নাটকের কোনো কোনো সিচ্যুয়েশন শেক্সপীয়রীয় কোনো সিচ্যুয়েশনের প্রভাবপুষ্ট। 'বিসর্জনে' নক্ষত্র রায়ের যে স্বগতোক্তি: "যেথা যাই, সকলেই বলে 'রাজা হবে?' 'রাজা হবে?' এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! একা বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে—'রাজা হবে?' 'রাজা হবে?'—" তা শুনে *Macbeth* এর অনুরূপ সিচ্যুয়েশনের কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক। আবার কোনো কোনো নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব অনেক বেশি সামগ্রিক এবং গুণগত। 'চিরকুমার সভা' নাটকটির মূল সুর নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় High Comedy-র তারে বাঁধা হয়েছে। 'শেষ রক্ষা' নাটকটি তো আগাগোড়া একটি *Comedy of Errors.* 'রাজা ও রানী' নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের রূপারোপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাট্যে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব এমন বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা সঙ্গত নয়, এটি সম্যক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পরিধিতে তা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এইটুকুই বলব যে তাঁর প্রাথমিক যুগের নাটকে নিঃসন্দেহে মহাকবির প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। পরবর্তী যুগে নানা কারণে তাঁর নাট্যশৈলীর গুণগত এবং আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং একান্ত আধুনিক মননশীলতার ফলশ্রুতি স্বরূপ এই নাটকগুলিতে শেক্সপীয়রের স্থান নেই।

তিন

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনা থেকে একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা নাটকের জন্মকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক যুগের নাটকগুলির রচনাকাল পর্যন্ত শেক্সপীয়রের প্রভাব সবিশেষ কার্যকর ছিল। এই প্রভাবের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অর্থহীন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী শেক্সপীয়রীয় প্রভাবের চরিত্র কোনো সময়েই গুণগত নয়, তা সবসময়েই বহিরঙ্গগত এবং নিতান্তই ভাসা-ভাসা। এই সিদ্ধান্তটি অনেকের কাছে চমকপ্রদ এবং স্ববিরোধী মনে হতে পারে। সেই কারণেই এটি বিশেষ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যুক্তিতর্ক দিয়ে সিদ্ধান্তটিকে প্রমাণ করবার আগে সকলের দৃষ্টি একটি বিশেষ ঘটনার দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করি। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' পর্যন্ত যে-সব নাটকেই শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার পদ্ধতি আরোপিত হয়েছে তার মধ্যে প্রায় কোনোটিই যথার্থ কালজয়ী হতে পারে নি। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে যখন কোনো নাট্যকার একই সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় পদ্ধতিতে এবং শেক্সপীয়রের প্রভাব-মুক্ত থেকে নাটক লিখেছেন তখন প্রথমোক্ত নাটকের চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকগুলিই বেশি সার্থক হয়েছে। অমৃতলাল বসুর 'রাজাবাহাদুর' একমাত্র নাটক যেখানে তিনি শেক্সপীয়রকে কাজে লাগিয়েছেন। অথচ এই নাটকটি আজকের দিনে গবেষকের টেবিলেই পড়ে থাকে। অপরদিকে তাঁর 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে' বা 'তিলতর্পন' যাতে শেক্সপীয়রের প্রভাব আদৌ নেই, সেগুলি এখনও পাঠক এবং দর্শক উভয়েরই প্রিয়।

এটি যদি সত্য হয়ে থাকে, এবং আমার ধারণা এটি সত্য, তাহলে তার কারণ কি? একথা ঠিক যে শেক্সপীয়রীয় নাটকে মানবজীবনের সাধারণ এবং শাশ্বত ভাব ও অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে। তা নাহলে তাঁর নাটক সর্বকালে এবং সর্বদেশে আনন্দের যোগান দিতে পারত না। কিন্তু আবার একথাও ঠিক যে প্রত্যেক দেশেরই এবং প্রত্যেক কালেরই একটি স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি থাকে। শেক্সপীয়রের নাটকের বিষয়বস্তু যত বিশ্বজনীন এবং সর্বজনীনই হোক না কেন, সেই বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গি এলিজাবেথীয় যুগের একান্ত নিজস্ব। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই বিষয়বস্তু ভালো লাগে এবং যদি আমাদের দেশের নাটকে সেই বিষয়বস্তুর স্থান করে দেওয়ার

চেষ্টা হয় তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যদি আমরা শেক্সপীয়রের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিটিকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চেষ্টা করি, তাহলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। রেনেসাঁস-এর পটভূমিকায় ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রা ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যা ছিল তার সঙ্গে উনিশ শতকী বা বিংশ শতকী বাঙ্গালী জীবনযাত্রা ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যবধানটুকু অনতিক্রম্য। তাজমহল যে সুন্দর এ-কথা শাজাহানের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু আজ যদি আমরা সবাই আজকের ঈঙ্গ-মার্কিন আর্কিটেকচারের যুগে আমাদের নিত্য বাসযোগ্য গৃহগুলিকে তাজমহলের মডেলে গড়ে তোলার চেষ্টা করি তাহলে যে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। এই সহজ যুক্তিটি যদি আর্কিটেক্চার এবং টাউন-প্ল্যানিং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে তা বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। এবং এই যুক্তিটি যে শুধু অবশ্যম্ভাবী তা নয়, এটি সব দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়ও বটে।

সবশেষে আর একটি ঘটনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যুগের নাটকে শেক্সপীয়রকে নানাভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নাট্যকাররূপে পরিণতি লাভ করবার পর থেকেই এই চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। কেন? রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে শেক্সপীয়রের নাটকের আবেদন চিরকালীন। কিন্তু তিনি আর একটি সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে উনিশ শতকের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে শেক্সপীররকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শেক্সপীয়রকে আজকের দিনে আদর্শরূপে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা ত্রিবিধ। প্রথমত, আজকের বিশ্বসাহিত্যে প্রধান সুর হচ্ছে বিশ্বজনীনতা। গ্যয়টে এই বিশেষত্বটিকে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন: “This is the era of world literature.” কিন্তু আজ থেকে চারশ বছর আগে শেক্সপীয়রের যুগে সাহিত্যে এই আন্তর্জাতিকতার সুরটি অনুপস্থিত ছিল। ফলত, শেক্সপীয়রের নাটকগুলি যে সমস্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেগুলি আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। *A Doll's House*-এ নোরার সমস্যা যে কোনো বাঙালী মেয়েরও সমস্যা, কিন্তু “হ্যামলেট” নাটকে incest-এর সমস্যা আমাদের পক্ষে এলিজাবেথান যুগের কোনো সাধারণ পাঠক বা দর্শকের তীব্রতা নিয়ে অনুভব করা সম্ভব নয়। স্বভাবতই আজকের দিনের নাটকে শেক্সপীয়রীয় সমস্যাগুলিকে

পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা অযৌক্তিক। শেক্সপীয়রকে আদর্শ করার দ্বিতীয় বাধা ফর্ম। এলিজাবেথান যুগের নাটকের ফর্ম ছিল পোয়েটিক ড্রামা। কিন্তু আজ বাংলাদেশে নাটকের সর্বাধিক প্রচলিত ফর্ম ন্যাচারালিজম্। ফর্ম এবং কনটেন্টের ভিতর সম্পর্কটা যে কত নিগূঢ় সে-কথা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটি কথা বোঝা দরকার। আজকের দিনে নানাবিধ কারণে বাংলাদেশে পোয়েটিক ড্রামাকে ফর্ম হিসাবে স্বাগত জানানো সম্ভব নয়। কাজেই যদি-বা আমরা আমাদের নাটকে শেক্সপীয়রীয় বিষয়বস্তুকে স্থান দেবার চেষ্টা করি, তা ন্যাচারালিস্ট ফর্মের কাঠামোয় সুষ্ঠু প্রকাশ পেতে পারে না। তৃতীয়ত, শেক্সপীয়রীয় নাটক প্রযোজনার যে বিশেষ আঙ্গিক, সেটি প্রচলিত করা বাংলাদেশের বর্তমান পটভূমিকায় নিছক টেকনিক্যাল কারণেই অসম্ভব। এই ত্রিবিধ অসুবিধার ফলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী যুগের নাটকে কখনো কখনো প্রকৃতিবাদী, কখনো সঙ্কেতধর্মী, কখনো বা প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছিলেন। আমার ধারণা তিনি ইতিহাসের নির্দেশকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আজকের দিনে যাঁরা শেক্সপীয়র রিভাইভালে উৎসাহী, তাঁদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে তাঁরা শেক্সপীয়র নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করুন, শেক্সপীয়র পঠনের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করুন। কিন্তু অতি উৎসাহের ফলে যদি তাঁরা শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলা পুনঃপ্রবর্তনের জিগির তোলেন তাহলে তাঁরা ইতিহাসের গতির বিরোধিতা করবেন মাত্র।

গোপাল হালদার

শেক্সপীয়র-সাক্ষাৎ

(পরিচয়-এর নিজস্ব প্রতিনিধির প্রেরিত)

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন শেষ হতেই বললাম, ভাগ্য ভালো আপনার দেখা পেলাম।

প্রশস্ত ললাট প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ, চাঁপা ঠোটে কৌতুক-সরস মৃদু হাস্যরেখা, আর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি চোখে কৌতুহলের ঔজ্জ্বল্য—এ মুখ চিনতে দেরি হত না প্রকাণ্ড টাকের জন্যও।

বল্লেন : ভাগ্য আমাদেরও ভালো! না হলে একসঙ্গে এই ফেব্রুয়ারী মাসে এতগুলো রৌদ্রভরা দিন পাই! তোমরাই এনেছ তোমাদের সঙ্গে এমন সূর্য, এমন আলো, এমন আকাশ।

ভারতীয়ের প্রতি এই সৌজন্যোক্তি পূর্বেও শুনেছি। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর স্বচ্ছতার সঙ্গে সহৃদয়তা মাখানো।

বল্লাম : ইংলণ্ড এই বঙ্গসন্তানের প্রতি সদাশয়। তাই লণ্ডনেও দেখি নি তার গোমরা মুখ, ধোঁয়াটে আকাশ, আর বৃষ্টি।

সোৎসুক কণ্ঠে তিনি বল্লেন : ইংলণ্ড ভালো লাগছে তাহলে?

আমিও স্বচ্ছন্দ মনে বল্লাম : নিশ্চয়, প্রায় নিজের দেশের মতো।

"নিজের দেশের মতো?"—নিম্নস্বরে অবিশ্বাসে কৌতুকে উচ্চারণ করলেন শব্দ কয়টি। প্রচ্ছন্ন একটু পরিহাসের স্নিগ্ধতা আমার প্রাচ্যসুলভ অত্যুক্তিতে।

'প্রায়'—শব্দটিতে জোর দিলাম আমিও সরস চিত্তে।

হাঁ, 'প্রায়'—তিনি পরিচ্ছন্ন হাসি হাসলেন : তবু তোমরা ইংরেজ রাজত্ব খতম করে দিলে তোমাদের দেশ থেকে।

আমি হাসতে হাসতে বলতে চাইলাম : ইংরেজ রাজত্ব ইংলণ্ডে ভালো, ভারতবর্ষে ভারতবাসীর রাজত্ব। কিন্তু 'কবির পূজা বিশ্বময়।' তাই না? আর ইংরেজই কি কম বুদ্ধিমান্—একশো বৎসর আগে থাকতেই গাইতে শুরু করেছে—Indian Empire will go, at any rate, some day, but this

Shakespeare does not go ; he lasts for ever with us ; we cannot give up our Shakespeare. তারপর Here, Isay is an English King.

ললাটে রক্তিম আভা দেখা দিল, কপোলে চোখে লজ্জার বিনম্রতা। সামলে নেবার জন্যই সকৌতুকে বললেন : কথাটা কিন্তু একজন স্কচম্যানের।

আমি সাংবাদিক, অপ্রতিভ হবার মতো নই। বললাম : ঠিক, কিন্তু সকল ইংরেজিভাষীর। তবে তাঁরা কেউ বলেন, 'কিং', কেউ বলেন, 'রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যান্'—

তিনি স্বচ্ছন্দে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন : বলুক তারা। তোমরা কি বলো?

আমরা তো বলেছিলাম "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

সেও তো এক শ বৎসর আগেকার কথা। এখন?

এখন যে কী বলব সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসা। অনেক নতুন তর্ক উঠেছে। আপনার সঙ্গে তাই নতুন করে বোঝাপড়া করতে হবে।

তাহলে একবার টেভার্ন-এ গেলে হত না? অর্থাৎ রেস্তোরায়—পানীয় থাকলে জমত—

এখানেই মন্দ কি? এই মেমোরিয়েল থিয়েটরের পার্শ্বে—অ্যাভনের তীরে। এসো বসি তবে—

বসতে বসতে বললাম : আমাদের সম্পাদক ভার দিয়েছেন—আপনার সঙ্গে চাই পরিচয়-এর পক্ষ থেকে একটা একান্ত সাক্ষাৎকার মানে, এক্সক্লুসিভ্ ইণ্টারভিয়্যু।

'এক্সক্লুসিভ্?'

মুখে হাসি থাকলেও চোখে একটু পরিহাসের বিদ্যুৎ। আমার সাংবাদিক দৃষ্টি তা এড়ায় নি। বুড়ো একটি পাকা ঘুঘু। আমিও কাঁচা রিপোর্টার নই।

বল্লাম: আপনি নাট্যকার। জানেনই তো আসর বুঝে কীর্তন—আমাদের আসরটা 'গ্রাউণ্ডলিং'দের নয়—ইণ্টেলেক্চুয়ালদের, বুদ্ধিজীবীদের।

গম্ভীর হলেন এবার—একটু সসম্ভ্রমে বল্লেন : তাহলে তো হিজ্ লর্ডশিপ্ ব্যারন্ ভেরুলাম এ্যাণ্ড্ ভাইকাউন্ট্ সেণ্ট অলবান্-এর সঙ্গেই আপনার সাক্ষাৎ করা দরকার।

একবারের মতো আমিও অপ্রতিভ হলাম—হিজ্ লর্ডশিপটি কে বললেন?

'ভাইকাউন্ট সেণ্ট অলবান্' জানেন না? আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ মনস্বী!

যিনি বলতেন 'I have taken all knowlege as my province'—তাঁকে তো তোমাদের না জানবার কথা নয়। ওঃ, হিজ্ লর্ডশিপকে যে তোমরা জানো বেকন বলে—ফ্রান্সিস্ বেকন—

লর্ড বেকন? আমি চমকিত হয়ে বলে ফেললাম।

হাঁ, হাঁ, 'লর্ড বেকন'—ও নাম আমাদের কালে চলিত হয় নি কিনা, তাই আমরা আমাদের লর্ড চ্যান্সেলর মহাশয়কে জানি ব্যারন্ ভেরুলাম আর ভাইকাউন্ট সেণ্ট্ অলবান্ নামে।

মুখে বিন্দুমাত্র হাসি নেই, রীতিমতো সীরিয়াস্ কিন্তু চোখের কোণে একটু হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল বলে আমার সন্দেহ হল। বুড়ো এক হাত নিলে। আচ্ছা।

ওই তো মুশ্কিল দেখুন—আমিও বিপন্ন ও অপ্রতিভ হবার মতো মুখভার করে বললাম: আপনাদের কালে কে যে কাকে কী নামে উল্লেখ করতেন, আর কী নামে যে কে লিখতেন, তাও সমস্যা। তারপর খুব ভালো মানুষের মতো বললাম: ফ্রান্সিস্ বেকনের কথাই ধরুন—তাঁর সব লেখার কী হিসেব পাওয়া গিয়েছে?

মুহূর্তেক তাঁর কপালের উপর দিয়ে একটা সংশয়ের ছায়া ভেসে গেল। তারপরে চোখে খেলল তীক্ষ্ণ ছুরির মতো হাসি, আর মুখে অটুট গাম্ভীর্য।

বল্লেন: নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। তিনি যে নাটক রচনা করতেন না তার প্রমাণ নেই। অথচ ছাখো, সে সব নাটক কোথায় গেল?

মুহূর্তেকে আমিও বুঝে ফেল্লাম—হেসে উঠলাম উচ্চকণ্ঠে। বিলিতী অপরাহ্নের শান্ত কোমল নিস্তব্ধতা সেই বাঙালী হাস্যে চিড় খেয়ে গেল। অ্যাভন-এর দু-একটা ভাসমান মরাল চমকিত হয়ে উঠল। তিনিও সে শব্দে সচকিত হয়ে চারদিকে তাকালেন—

তখন হাসি শেষ করে বল্লাম: কোথায় গেল জানেন—আপনি মেরে দিয়েছেন।

হাসি ফুটে উঠল মুখে। তিনি সকৌতুকে বললেন: এই তো তোমরা জানো! আগেই বুঝেছিলাম—ধরা পড়ে গিয়েছি। ফাঁকি চলবে না তোমাদের কাছে।

মনে মনে বললাম, এখনো কি! কতটা ধরা পড়েছেন, এখনো তা জানেন না। মুখে বললাম: না জানলে উপায় ছিল? পরীক্ষায় ফেল হয়ে যেতাম।

কালিদাস কে ছিলেন জানি না। কিন্তু শেক্সপীয়র কে ছিলেন তা না জানলে চলে? তবে দেখুন, আপনি সেই চোরের উপর বাট্‌পাড়ি করেছেন।

সোৎসুক কণ্ঠে বল্লেন: কেমন?

এই ধরুন নাটকগুলো না হয় আপনি মেরে দিয়েছেন—লিখুক তা বেকন। বেকনই কি বড়ো সাধু? চুরি করেছেন দু'হাতে।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললেন: সে কি কথা! তিনি রাণীর ধর্মাধিকরণের কর্তা, ন্যায়ের অবতার।

তাও শেষ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেন নি! যাক্ বেকন, কিন্তু ঐ নাটকগুলি তো আগাগোড়া চুরি।

তিনি চমকিত হলেন, বললেন: কেমন, বলো দিথিন?

আমি শুরু করলাম: প্রথমত, একটা প্লটও মৌলিক নয়। ঐতিহাসিক নাটকগুলো বলবেন না হয় মৌলিক হবে কি করে? তবু হলিনশেড আর যত ইতিকথা লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া। রোম-ইতিহাসের কাহিনীগুলো তো প্লুটার্কের 'জীবনীমালা' থেকে ছেঁকে তোলা—নর্থ-এর অনুবাদের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে পড়া যায়। এমনকি, লজ, গ্রিন্‌কে পর্যন্ত 'এজ্ ইউ লাইক ইট্', 'দি উইণ্টারস টেল' 'অল্‌স্ ওয়েল ছাট্ এণ্ডস্ ওয়েল্', 'সিম্বেলিন্' প্রভৃতিতে বেমালুম মেরে দিতে ছাড়েন নি। 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট্', 'মাচ্ এ্যাডো এবাউট নাথিং'—এসব তো ইতালীয় রম্যন্যাস থেকে নেওয়া। 'ওথেলো', 'মেজার ফর মেজার' আবার সমকালীন ইতালীয়ান লেখকের কাহিনী-চুরি। হাসছেন? এখনো শেষ হয় নি—

তিনি হেসে বললেন: ও তালিকা শেষ হবে না। কিন্তু কেন বলছ চুরি? অবশ্য বেকন কি বলতেন জানি না, আমরা একে চুরি বলতাম না। মনে কর—একটা গল্প ভালো লাগল; সবাই জানে তা আমার নয়। কিন্তু তা সাজিয়ে গুছিয়ে লাগসই করে তুলতে হবে, তুললে আমার হবে। চুরি একে কি করে বলো?

আমরা চুরি ছাড়া আর কিছুই বলি না। এরই নাম 'সাহিত্যে চুরি'। এখন এ রকম কাজ কেউ করলে মাসিকে লিখতাম সাপ্তাহিকে লিখতাম দৈনিকে লিখতাম। আদালতেও দৌড়াতাম—অবশ্য যা 'আসল' তাই যদি আবার ইংরেজি বা অন্য ভাষা থেকে 'নকল' বলে প্রমাণ হবার ভয় থাকে তা হলে ওদিকে পা বাড়াতাম না।

ভাগ্যিস তোমাদের কালে জন্মাই নি আমরা। আমাদের কালে মৌলিকতা বলতে এসব বোঝাত না।

একেবারেই কি বোঝাত না?—an upstart Crow beautified with our ferthers, এবং Tygers heart wrapt in Player's hide বলে the onely Shake-scere in the countrieকে গ্রীন্ গাল দেন নি? আপনি তখন নট থেকে নাট্যকার হয়ে উঠছেন, থিয়েটরে নাম করছেন—তাই হয়তো রবার্ট গ্রীন-এর খোঁচা গায়ে লাগে নি। তবু দু-একজনা তো জানত আপনারা যাঁরা নাম করছিলেন তাঁরা অনেকেই Purlyonde his Plume চোরাই মালের কারবারী।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন: ব্যাচারা রবার্ট গ্রীন্! তখন তার চরম দশা—টাকা নেই, স্বাস্থ্য নেই, নাটক কেউ নেয় না, নতুন নাট্যকারদের উপর রাগ হওয়া তো তার স্বাভাবিক। নাম দেখেই বুঝলে ও বুঝি আমি লিখেছি। তারপরে লোকেরও কাণ্ড ত্যাখো—তারা গ্রীন্-এর ওপর চটে গেল মিছামিছি।

যেন গ্রীন্-এর জন্য তিনি দুঃখিত। আসলে বুঝলাম চালাকি করে মূল কথাটা চাপা দিচ্ছেন। আমি বললাম: কিন্তু কথাটা তো ঠিক। আমরা দেখছি 'লাভ্স্ লেবর্ লস্ট' ছাড়া সম্ভবত কোনো নাটকের মূল কাহিনী আপনার নয়।

তিনি বল্লেন: নাটকগুলোই কি আমার? তবে কি জানো, তখনকার দিনে কাহিনীর ছাঁচ দিয়ে আমরা লেখার মৌলিকতা স্থির করতাম না। মাল-মশলা যাই হোক, কী গড়া হল, তাই ছিল কথা। সেই গড়াতেই দেখা যেত কারিগরের হাত—কাদামাটি কোথাকার তা দিয়ে কি হবে?

চুরিটা কবুল করলেন, কিন্তু চালাকি ছাড়লেন না। আমিও বললাম: কথাটা কিন্তু তা নয়। কার ছাঁচ তাই কথা। ধরলাম বেশ, কী গড়া হল আর কেমন-করে গড়া হল তাই কথা, ছাঁচের কথা অবান্তর। ছাঁচের কথা ছেড়ে ছাঁদের কথাও ধরুন—দেখুন জন লাইলির 'ইউফুউজম্' নিয়ে পরিহাস করলে হবে কি, সে ছাঁদ আপনাকেও প্রথম পেয়ে বসেছিল। আর তাঁর 'হাই কমেডির' ছাঁদ না নিলে 'লাভ্স্ লেবর্ লস্ট' থেকে 'মাচ্ এডো এবাউট্ নাথিং' কেন, 'এজ ইউ লাইক্ ইট্' পর্যন্ত হালকা হাসির নাটকে অমন করে রাজা-রাণী, আমীর-ওম্রাহ্, সাহেব-বিবি পর্যন্ত মহাসম্মানিতদের হাসির আসরে টেনে এনে হাজির করতে পারতেন? পথের মানুষের বেপরোয়া জীবনের নাট্যকার

সেই টমাস গ্রীন্ আর খ্রীষ্টফার মার্লো বিরাট মানুষের বিরাট আকাঙ্ক্ষার নাট্যকার: তাঁদের ছাঁদ, ভাবভঙ্গি ছাড়া হত ওসব নাটক? আর, মার্লোর 'mighty line' উদাত্ত রাণী, জন কীড্-এর blood-and-thunder রক্ত-বজ্রবর্ষী ট্রাজেডি না পেলে 'হ্যামলেট' 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো', 'লীয়র', এসবের রূপ কী দাঁড়াত?

তিনি এবার একটু যেন মোলায়েম হলেন, ভাব দেখালেন কথাটায় সায় দিচ্ছেন: খুব ঠিক কথা। ওঁরাই থিয়েটরের আসর বেঁধেছিলেন। সে কি সহজ কথা! কথার চাতুরি, হাসির হররা, কবিতার উদাত্ত আহ্বান, ঘটনার বজ্রবিদ্যুৎছটা—না, কী মেহনতটাই না ওঁরা করেছেন! যার যা সাধ্য দু হাতে জুগিয়েছেন, তবে তো থিয়েটরে মানুষ জুটেছে। আর কত শ্রেণীর মানুষ! হুল্লোড়বাজ মানুষ, রুচিবান্ মানুষ, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ, কর্তারা গিন্নীরা, বড় ঘরের বিলাসীরা বিলাসিনীরা আর স্বয়ং রাণী, তাঁর পারিষদ সহচর অনুচর—কে না? আবার সকলকেই খুশি করতে হবে। কত রকমের মানুষ, কত রকমের রুচি, কত রকমের তাদের ফরমায়েস। কাউকে 'না' বলার উপায় নেই। পুরনো, নতুন, গল্পগাঁথা, যার থেকে যা পাওয়া যায় দু হাতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তবে তো তৈরি হয়েছে আমাদের দিনে এক-একটা নাটক। একটা কিছু দাঁড়িয়ে গেছে। সবসুদ্ধ কী দাঁড়িয়েছে, তাই হল আসল কথা।

বেশ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বললাম: কী দাঁড়িয়েছে—কার হাতে, কী তার মনের কথা, তাই হল আমাদের কালের জিজ্ঞাসা।

মনের কথা? তোমাদের হেঁয়ালি বোঝা বড় শক্ত।

বুঝলাম—আর ধরা-ছোঁয়া দেবেন না। অন্য দিক দিয়ে নিতে হবে। বললাম: আর আপনাদের? So thou, being rich in *Will* add to thy *Will* One will of mine to make thy large *Will* more. হেঁয়ালি নয়?

চোখে খুশি খেলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বললেন: And thou lovest me, for my name is Will. হেঁয়ালি কোথায়? উত্তর দেওয়াই আছে।

বুঝলাম এবার মুখ ফিরেছে সনেটের দিকে। আরম্ভ করা যাক এদিক থেকেই। বললাম: তাতেই তো হেঁয়ালিটা আরও জমেছে—কে এই 'thou', আর সত্যই কে ওই 'Will'?

সে তো তোমরা জানো—এই গ্রাম্য শহরে জন্মেছিল 'উইল', উইলিয়ম

শেক্সপীয়র—সেই বাড়িও দেখেছ ; দেখেছে সেই গ্রামার স্কুল, তাতে ছু-চার বছর পড়েছিল ; শিখেছিল ছু-চার অক্ষর—

আমি হেসে থামিয়ে দিয়ে বললাম : 'লিটল লাতিন অ্যাণ্ড লেস গ্রীক'—বলবেন তো ? সে গল্প জানি। কথা হচ্ছে, নাটক ছাড়া কবিতাও তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে আবার ওই শত দেড়েক সনেট—মোট ১৫৪টি—আর তাতে আপনার সেই উইলিয়াম শেক্সপীয়র 'unlocked his heart'। কিন্তু আমাদের কালের সন্ধানীরা বলেন, তাতে আসলে জিনিসটা চাপা দেওয়ারই চেষ্টা। তার প্রমাণ ওই 'thou'-এর চাবিটি আপনার লুকিয়ে ফেলা। কিন্তু সেইটিই আমাদের কালে উদ্ধার হচ্ছে master-key—তাতে নাটকের তালাও খুলে যাবে। এই সনেটের হেঁয়ালি থেকেও যে আমাদের পণ্ডিতেরা আপনার মনের চেহারা চিনবার সুযোগ না পেয়েছেন তা নয়।

এবার তিনি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না—কেউ পারে না। বিশ্বাস না করলেও যেমন দৈবজ্ঞের কাছে হাত না বাড়িয়ে কেউ পারে না, মন নিয়ে মাথাব্যথা না থাকলেও নিজের মনের কথা শুনবার জন্য তেমনি সকলেরই থাকে আগ্রহ। বললেন : বলো তো শুনি সনেটের থেকে আমার মনের চেহারা কেমন দেখেছেন তোমাদের পণ্ডিতেরা ?

আপনাদের লেখকদের অনেকেরই যেমন হয়—একটু বাঁকা-চোরা।

হাঁ, হবে না। বলতে জানেন, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

তাই বুঝি ?—কৌতুক খেলে গেল চোখে,—বেশ, তুমিই না হয় বলো মুখ ফুটে।

তৈরি হলাম : বলছি—আমার কথা নয়, মনোবৈজ্ঞানিকদের কথা। আপনাকে বলতে বাধা নেই—আপনার মুখেও তো কিছু বাধে না—তাই একালের মনোবৈজ্ঞানিকদের কথা শুনতে বাধা দেবে না। 'হোমোসেক্সুয়ালদের' বাধ্য হয়েই বাঁকা-চোরা হতে হতে হয়, আইনের বাধা, সমাজের বাধা—হেঁয়ালির আশ্রয় নিতে হয়।

যা ভেবেছিলাম—তাই। ভদ্রলোক একবারের মতো বিমূঢ় হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই সতর্ক হলেন। তাকে অসতর্ক করে রাখা কিন্তু চাই। তাই বললাম : এসব গুহ্য তত্ত্ব আমরা বেশি জানি না—তবে আপনারই যে কথা Two loves have I একজন সখা, আরজন সখী। সে হেঁয়ালিটা আমাদেরও বুঝতে হবে তো—

A woman's face, with Natures own hand painted,
Hast thou, the master-mistress of my passion.

কাকে সম্বোধন করে বলেছেন, কে সে ? 'ডব্লু-এচ' কি ? না, তরুণ লর্ড পেমব্রুক ? না, আপনার মুরুব্বি লর্ড সাদামটন ; না, আর কেউ ? ওরা শুধু উপলক্ষ্য, লক্ষ্য অন্য কেউ ?—আর, কে সেই কবি 'proud sale of his verse' দিয়ে যে আপনার সখার চিত্তাকর্ষণ করেছে ? তারপর, কে সেই dark lady, আপনার শ্যামা সখী, now is black beauty's successive heir যিনি আপনার সখাকেও আপনার থেকে অপহরণ করেছেন ? কে, পেমব্রুক ও মেরি ফিটন ? না, সাদামটন ও জেন্ ডেভেনাণ্ট ?

জেন ডেভেনাণ্ট ?—ভদ্রলোক যেন চিনতেই পারছেন না, কে।

ডেভেনাণ্ট—অক্সফোর্ডের সরাইখানার মালিক জন ডেভেনাণ্ট-এর স্ত্রী—উইলিয়ম ডেভেনাণ্ট-এর মা। জেন ছিলেন রূপসী ও রঙ্গিনী। আপনার মতো ভাড়াটে লেখকের অপেক্ষা আপনার মুরুব্বিটি স্বভাবতই তার সঙ্গে জমিয়েছিলেন বেশি। তবে আপনারও ভাগ্যে ছিটেফোঁটা জুটেছে। আপনার নামে ওর ছেলের নামকরণটা একেবারে তো অকারণ নয়। অবশ্য সনেটের সাক্ষ্যের সঙ্গে আবার নাটকের স্বাক্ষ্যও মিলিয়ে দেখবেন মনস্তাত্ত্বিকরা।

এবার ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে বললেন : এর পরেও আরও সাক্ষ্য ?

আমিও ছাড়লাম, না সে সবও গুরুতর। 'হ্যামলেট'-এর সমস্যাটা অকারণে আপনাকে আকর্ষণ করে নি।

কারণ থাকবে না কেন ? তবে তোমরাই বল কী তা।

একালের মনের grave-diggers-রা বলেন, হ্যামলেট ঈদিপাস-সিচুয়েশন-এ দ্বন্দ্বগ্রস্ত। মাতৃআকর্ষণ ও পিতৃদ্রোহে মন তার দ্বিখণ্ডিত। এ দ্বিখণ্ডিত মানুষের যা ঘটবার না হয় ঘটেছে। কিন্তু সেই ঈদিপাস কমপ্লেকস-এর চাবিটি হাতে এলেই বুঝা যায়, 'হ্যামলেট'-এর নাট্যকার কেন প্রায় মায়ের বয়সী এ্যান হাতোয়ের হাতে ধরা দেন, আর কেন তার থেকে আবার দূরেও পালান—

হঠাৎ তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন : ধরা দিলাম আবার পালালাম !

হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলে হবে কি ? এটা ফ্রয়েডের যুগ, মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারবেন না।

তিনি কৌতুকের কণ্ঠে বললেন : আমি গোপন করবার চেষ্টা করেছি

কখনো বললামই তো Two loves have I, একজন সেই master-mistress of my passion, আরেকজন সেই dark lady ; এবং

Him have I lost : thou hast both him and me.

ডেপথ সাইকোলজি বলবে—এহ বাহ্য। আসলে আকর্ষণ খুঁজতে হবে অচেতন মনে।

তোমরা তাই আরও জোটালে। মা নিয়ে টানাটানি, তাতেও শেষ হল না, তখন এ্যানকে তুলে দিলে মায়ের পর্যায়ে। অতটাও কিন্তু বয়স হয় নি এ্যান-এর তখনো। তার সঙ্গে সম্পর্কটাও আমার অচেতন মনের নয়। তা গোপনও ছিল না।

পরিহাসের তরল কণ্ঠে তিনি প্রায় সবই উড়িয়ে দেন আর কি। আমিও ছাড়লাম না : গোপন রাখা গেল না বলেই। না হলে কেন সনেটের ওই দুজনার নাম গোপন করলেন ? কেন বললেন না কার ছিল কি বয়স ?

মুচকি হেসে বললেন : কার নাম করব বল ? কতজনকে কত সময়ে মনে পড়েছে। ও-সব কি এক-আধ মাসের, না, এক-আধ বছরের লেখা ? কাউকে না মনে করেও তো লিখেছি—আশার কথা তার চেয়েও বেশি নিরাশার কথা বলেছি, প্রকৃতির কথা শিখেছি। আবার লিখতে-লিখতে মনে এসে গেছে কখন কারো মুখ। আসল কথা লিখেছি—যখন ঝোঁক চেপেছে, ভাব মিলেছে, খুশি হয়ে উঠেছি শব্দের সঙ্গে শব্দ গাঁথতে গাঁথতে—

বুঝলাম বুড়ো সেয়ানা। চালাকিতে হার মানাতে চায়। বললাম: দেখুন, ওসবে হয় না। আমাদের যুগে ফ্রয়েডীয় সাইকোলোজিতে লেখকেরাও দিকপাল—বিশেষত গল্প ও কবিতা লেখকেরাও। শুনলে হাসবেন—'খেয়াল মতো লিখেছি, খুশি মতো লিখেছি।'

তা তো বলি নি। সত্যকথা এই—লিখেছি গরজে। সবাই তখন সনেট লিখছে। শুরু করেছিলেন ওয়াট ও স্যারে। তখন ইতালি ও ফ্রান্সের হাওয়া বইছে দেশে। সনেটের হাওয়াও উঠল। আর সেই স্যার ফিলিপ সিডনি লিখলেন 'অ্যাস্ট্রোফেল এ্যাণ্ড স্টেলার' প্রেমের কথা—জোয়ার লাগল আমাদের সনেটের স্রোতে। এডমণ্ড স্পেনসার, গ্রেভিল ফুলকে, বার্নবে বার্নেস, গাইলস ফ্লেচার, লজ, উইলোবি, পার্সি, কনস্টেবল, ডানিয়েল, ড্রেটন—

বাধা দিয়ে বললাম : তালিকা বাড়িয়ে কি হবে ? বলুন, আপনি কেন লিখলেন ?

সবাই লিখছে বলে।

বুঝলাম—সেই এক বুলি। তাই কণ্ঠ নামিয়ে ধীর ভাবে বললাম : বেশ। কাদের মনে করে লিখলেন।

সত্যকথা বলব ?—সিডনি আর স্পেনসার। তারা ছিল মনে। ওঁদের মতো সনেট আমাকে লিখতে হবে। সিডনির মতোই :

"Fool", said my muse, "look into thy heart & write"

তাই তো জিজ্ঞেস করছি—সেই 'হার্টের' মধ্যে কে ছিল ?

অতি সহজ তা বোঝা। কবি পালককে প্রেমের পাত্ররূপে সম্ভাষণ করেছি। ছলনাময়ী নারীর রূপ বর্ণনা করেছি ; তাকে ছলনার জন্য দোষারোপ করেছি, প্রেমের আশা-নিরাশা, বেদনা-বিষাদের কথা সব বলেছি। এসব যে প্রথাসিদ্ধ বিষয় সনেটের। তেমনি প্রথাসিদ্ধ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বক্রোক্তি, conceit। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে, উপমার সঙ্গে উপমা জুড়ে, সে সবও তৈরি করেছি। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, প্রেমিক ও প্রেমিকার মতো প্রথাসিদ্ধ কাব্যবিষয় আশ্রয় করে সনেট রচনা করলে কেউ পড়ত নাকি আমার সনেট ?

বুঝলাম এ বিষয়ে লোকটা এখন সতর্ক, কেবলি কথা বাড়াবে, নতুন নতুন সাফাই আবিষ্কার করবে। শেষবারের মতো তবু বললাম : অর্থাৎ বলছেন পেমব্রুক-মেরি ফিটন, কিম্বা সাদামটন-জন ডেভেনাণ্ট—এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আপনার সনেটের ?

ছিল না কে বলে ? পেমব্রুক-সাদামটন ছাড়াও কত মানুষের মুখ মনে পড়েছে—আমাদের থিয়েটরের দলের যে ছোকরাগুলো মেয়ের পাঠ করত, A woman's face with Nature's own hand painted কত জনাই তো ওরা ছিল অমনি মেয়েলি চেহারার। আবার, raven black eyesও ছিল কত black beauty-র। কেউ বাজিয়েছে ভার্জিন্যাল, কেউ বাজিয়েছে আমার মন, সাজিয়েছে আমার কবিতা নিজেরও অগোচরে—তারা তো উপলক্ষ্য। শুধু মেরি ফিটন, জেন ডেভেনাণ্ট ? আর কাউকে তোমরা দেখ নি ?

চোখে তার দুষ্টুমির হাসি খেলল আবার। গলাটা একটু নিচু করে বললেন : এ্যান্ হাতোয়ে নাম্নী মেয়েটিও তো একেবারে বাদ পড়ে নি মনের কোঠা থেকে।

'এ্যান্ হাতোয়ে?—আপনার সেই স্ত্রী?'—প্রতিবাদ না করে পারলাম না: যাকে 'দু নম্বরের খাটখানা' ছাড়া আর কিছু দিতে শেষ অবধিও আপনি চান না?—একথা কোনোকালে আপনার কেউ মানবে না।

মৃদু হেসে বললেন: না মানুক। আমি জানি, আর আমার মন জানে।

আমি বললাম: তাহলে বাড়ি ছেড়ে পালালেন কেন? বছরের পর বছর থিয়েটরে হৈ-হুল্লোড় নিয়ে, মারমেড ট্যাভার্নে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় গল্পে কি-করে মেতে ছিলেন?

কিন্তু ভুলে থাকি নি।

থিয়েটর অভিনয়, ট্যাভার্নে আড্ডা—এ সব তো ভালোবাসতেন, চাইতেন—

সাইকোলজি নিয়ে না ঘাটিয়ে আমি এবার অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইলাম ওর দৃষ্টি—আমাদের নিজেদের তর্কে।

বললেন: তা আর বলতে!

নাটকও লিখেছেন খান ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

যদি বেকন তা না লিখে থাকেন।—আবার দুষ্টুমিতে ভরা চোখ।

ওঁকে আরও সহজ স্বচ্ছন্দ করে তুলবার জন্য আমি বললাম: ওসব বাজে কথা থাক্। লিখেছেন আপনি। গ্রীন্ থেকে বেন্ জনসন পর্যন্ত আপনার কালের আপনার শত্রুমিত্র সকলের কথা উড়িয়ে দোব, অত বড়ো বিদ্যাদিগ্‌গজ আমরা নই।

এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ওর ছিল না। তবু পরিহাস ছাড়লেন না: তোমরা যে বুদ্ধিজীবী। বুঝতে তো পারো অতগুলো নাটক লিখতে বিদ্যাবুদ্ধি দরকার। আমার মতো সাধারণ মানুষের একটা ভাড়াটে নটের পেটে অত বিদ্যে আসবে কোত্থেকে? ঠিক না?

ঠিক উল্টো। আমরা—মানে আমাদের সম্পাদক—মনে করেন বেকন দূরে থাক্ সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে ওসব নাটক লেখা অসম্ভব।—বেকন না, মার্লোর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বানও না।

তিনি কুতূহলী হলেন: সে কি হে? এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলে—আমি হোমোসেক্সুয়াল ঈদিপাস-কম্পলেক্সগ্রস্ত পার্ভার্ট।

আমাদের মত নয়—সাইকোলজিস্টদের মত।

তিনি আশ্চর্য হলেন: তোমাদের আবার তাহলে কী মত?

গম্ভীর ভাবে আশ্বস্ত করে জানালাম: আমাদের—মানে, আমাদের সম্পাদক-মণ্ডলীর মতভেদ হচ্ছে। সম্পাদক বলছেন, আপনি নর্মাল ম্যান্, যা অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপার।

কি রকম বলো তো?

এই স্ট্রাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন-এ জন্মেছেন, ওয়ারউইকের চাষীদের সঙ্গে থেকেছেন, স্কুল ছেড়ে দোকান-পশার নিয়ে বসেছেন, এ্যান্ হাতোয়ের খপ্পরে পড়ে ১৮ বছরে হয়ে পড়লেন মেয়ের বাপ। তারপর, সংসারে অন্ন নেই, খাবার লোক আছে, দোকানের আয়ে কুলোয় না, ঘরে খেয়েছেন এ্যান-এর ঝাঁটা, বাইরে হরিণ চুরি করে স্যর টমাস লুসির চাবুক। পালালেন লণ্ডনে। সেখানে তখন জীবনের জোয়ার। তবু কি কম ঘাটের জল খেয়েছেন? থিয়েটারের দুয়ারে প্রথম ঘোড়ার পাহারাদার, শহরের যত রাজ্যের ইতর ভদ্র—বেপরোয়াদের ইয়ার-দোস্ত। তারপরে স্টেজের পিছনে প্রোম্‌টারের হুকুমদার; প্রোমোশন পেয়ে অভিনেতা; ক্রমে পালা-লেখায় হাত পাকিয়ে নাটুকে শেক্সপীয়র আর থিয়েটরের অংশীদার থেকে শেষে থিয়েটারের মালিক, কর্তা,—একবার দেখে নিলাম মুখভাব; খুশিতে তা স্বচ্ছন্দ—তারপর ধীরে ধীরে বললাম: তাই তো আমাদের সম্পাদক বলেন সাধারণ সংসারে না জন্মালে গ্রামের শহরের অমন নানা জাতের মানুষকে চিনতে পারতেন না, কখনো ভালোবাসতে পারতেন না সাধারণ মানুষকে; আর লিখতে পারতেন না ওরকম নাটক। দেখুন না, ফলস্টাফ-এর যত হতচ্ছাড়া শহুরে সঙ্গীরা আপনার চেনা, তাদের ভাষা আপনার মুখস্থ। ডগব্যারির সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে। জষ্টিস শ্যালোকে তো জীবন্তই দেখেছেন। মেরি ওয়াইভসদের চিনতেন—এই স্ট্রাটফোর্ডেরই লোক তারা। আর ওই কবর-খুঁড়িয়ে, দারোয়ান্, মালী—বিশেষ করে যত রাজ্যের 'ফুল'—তারাই হল আপনার কথার বাহন।—

একটু থামো—আমার কথায় বাধা দিলেন। বললেন: আমার কথার বাহন কে?

যত ওসব ছোটলোক।

ছোটলোক হোক, যাই হোক, আমার কথার বাহন হবে কেন তারা? তারা তাদের কথার বাহন, নিজের নিজের কথা বলেছে।

শুধু তাই কি? না, তাদের মতো অন্য মানুষের কথাও। 'ফুল' যেমন, লিয়র-এর মতো—উৎপীড়িত মানুষের মুখপাত্র। আর, আমাদের সম্পাদক বলেন,

সেই সূত্রে 'ফুল,' সকল মানুষের মুখপাত্র। কি বলেন সম্পাদকের এই মত সম্পর্কে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন: সেই সম্পাদকীয় মতামতের জন্য তোমরা বুঝি দায়ী নও ?

ধূর্ত বুড়ো ধরেছে ঠিক। বললাম: এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দু রকমেরই আপত্তি—লাইন ঠিক করতে হবে। তাই তো আপনার কাছে আমাকে পাঠানো হল।

তিনি হাসতে লাগলেন—আমার কাছে। আমি কি করে জানব তোমাদের বামপন্থীই বা কি, দক্ষিণপন্থীরাই বা কি ?

সম্পাদকের সঙ্গে কেউ একমত নয়। বামপন্থী বন্ধু যাঁরা তাঁরা বলেন, আপনি সাধারণ মানুষের মুখপাত্র হবেন কি করে ? আপনি রাজা-রাজড়াদের নাটক লিখেছেন। তাতে সাধারণ মানুষ তো নিতান্ত নগণ্য, শাসকবর্গ গোষ্ঠীই আপনার নাটকের নায়ক-নায়িকা, প্রধান পাত্র-পাত্রী। তারাই আপনার কথার বাহন ?

কিন্তু সেই রাজা রাজ-রাজরাই আমার কথার বাহন হবে কেন ? তারা কি তাদের কথা বলে নি ?

খুব বলেছে। যা তাদের সাধ্য তার থেকেও ভালো করেই আপনি তাদের তা বলিয়েছেন। কারণ আপনিও বলতে চেয়েছেন তাদের বক্তব্য।

সে তোমাদের যা ইচ্ছা বলো। আমি চেয়েছি যে-যেমন, তেমন-করে সে ফুটে উঠুক। রূপ নিক, দাঁড়াক, দর্শকেরা সামনে দেখতে পাক। আর সবসুদ্ধ নাটকটা গড়ে উঠুক, যাতে অভিনয় জম্‌বে।

সেই হেঁয়ালি 'Others abide our question, thou art free ?' বুড়ো ধরা-ছোঁয়া দেবে না এ-ভাবে। কিন্তু কথা না বের করলে নয়। এতদূর এলাম কেন তবে ? আমি মেনে নেবার ভাব দেখিয়ে বললাম:

আমাদের সম্পাদক বলেন,—সব সত্ত্বেও তাই বক্তব্যও আপনার আছে। যেমন, রোমিওতে তুলেছিলেন প্রেমের বাধাবন্ধহীন প্রকাশের দাবি। জ্যাকুইস্ হয়ে দেখেছেন জীবনের তুচ্ছতা আর অর্থহীনতা। হ্যামলেট দ্বন্দ্বাকুল দার্শনিক মনের আত্মদ্বন্দ্ব ও অপচয়। ম্যাকবেথ, দুর্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার পতনে নিঃশেষতা। আর প্রোসপেরো, মানুষের ভালো-মন্দের সম্বন্ধে নিশ্চিত

না থেকেও সকলের প্রতি একটি সকরুণ প্রসন্নতা। এমনি করে আপনার দৃষ্টি ক্রমশ পাকা হয়ে উঠেছে, বক্তব্য গভীর হয়েছে।

আমি কিছু হব কেন ? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে চোখ ফোটে, তা বল। বেপরোয়া দুরন্ত যৌবনের চোখে হাসি, হুল্লোড়, আমোদ, উৎসব, প্রেমের অপরাজেয় দাবি—এই মনে হয় সব। আসে তার পর সংশয়, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব বিরোধ, প্রবৃত্তির তাড়না, বিপর্যস্ত কালের বিড়ম্বনা—এসব না দেখে উপায় আছে ? আর দেখার সম্পূর্ণতা কোথায় যদি না দেখ তাও শেষ পর্যন্ত—আলো-আঁধারের জালি-কাটা জীবনের ফাঁকে বিশ্বময় এই চিরায়মান চিত্রবহতা।

বলতে বলতে অনেক অনেক দূরে চলে গিয়েছে দৃষ্টি—বললাম:

এইটাই তো আমাদের সন্দেহ। আমাদের সম্পাদক বলেন; বিশ্বরূপ দর্শন আপনার ভাগ্যে ঘটেছে।

তিনি চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে হেসে ফেললেন: ওরে বাবা! এখনি বলবে আমি থিয়েটরের ব্যবসা ছেড়ে ভগবানের স্তব করতে বসে গিয়েছি।

আমাদের সম্পাদক বলেন—তা করেছেন আমাদের মহাভারতকার। জীবনের বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল—এই তো ভগবানের বিশ্বরূপ। আর আপনার হল ঠিক উল্টো—আপনি এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে দেখতে দেখলেন মানুষের বিশ্বরূপ—মানুষ আর মানুষ আর মানুষ।

তিনি হেসে বললেন: চোখ খুলল না। দিব্য চোখটা খুলল না। ভগবানের বিশ্বরূপ দেখতে পেলাম না।

কিন্তু বললেন তো—এও মায়ার খেলা।

We are such staff
As dreams are made of, and all our little life
Is rounded with a sleep.

তা তো প্রোসপেরোর কথা—

তাঁর কথাই তো আপনার কথা। তার বিদায়বাণী আপনারও থিয়েটরের নিকট বিদায়বাণী। এ বিষয়ে বাম-দক্ষিণ আমরা সকলেই প্রায় একমত। তবে দক্ষিণপন্থীরা কেউ কেউ বলেন প্রোসপেরো আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মুখপাত্র। অন্যরা বলেন—সে আপনার পেটি বুর্জোয়া রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস। কি বলেন আপনি ?

এতো আরও হেঁয়ালি মনে হয়। বুঝিয়েই বলো—

যেমন, আমাদের দক্ষিণপন্থীরা বলেন, প্রোস্‌পারোই আপনার চোখে ভাবী দিনের বৈজ্ঞানিক—যাঁরা প্রকৃতির রহস্য জানবেন, তার দান কার্যে প্রয়োগ করতে পারবেন, মানুষকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সঙ্গে সঙ্গে মিরাণ্ডা-ফার্ডিনাণ্ডের ভালোবাসা, রোমিও-জুলিয়েটের উদ্দাম আতিশয্যে ভেসে না গিয়ে, মিলন-সুষমায় সার্থকতা লাভ করবে ; বেতন দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রমজীবী মানুষ হবে স্বচ্ছন্দ চিত্ত এরিয়েল ; অর্ধসভ্য মানুষ সংযত সকৃতজ্ঞ ক্যালিবান্। বিজ্ঞানের সম্বন্ধে এই স্বপ্নই নাকি আপনি টেম্পেস্ট-এ আভাসিত করেছেন—সেই brave new world-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়-এর দিনে—আধুনিক যুগের উষাকালে। আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা অনেকেই অবশ্য একথা মানে না।

আমিও মানতাম কিনা জানি না-–তোমাদের এই বিজ্ঞানের যুগে বেঁচে থাকলে। সেদিনে প্রোস্‌পেরোই কি মানত মিরাণ্ডার brave new world-এ ষ্টিফানো, ট্রিংকিলো ক্যালিবান্‌রা অমনি 'goodly creatures' হয়ে উঠবে? কি জানি। কিন্তু তাঁরা কি বলেন যারা এ মতের বিরোধী ?

তাঁরা বলেন, আপনার প্রোসপেরো তো স্পষ্টই জানিয়ে দিলে this rough magic I hereby abjure.

অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিরোধী। আসলে বিজ্ঞানে বিশ্বাস আপনারও নেই—প্রোসপেরোরও ছিল না। টেম্পেস্ট হচ্ছে আপনার পেটি বুর্জোয়া শেষ স্বপ্ন-বিলাস। পেটি বুর্জোয়া চাইবে বরং গঞ্জেলোর আদর্শে অলস প্রকৃতি-নির্ভরতা—ইউটোপিয়া, নিউ এ্যাটলান্টিস্-এর জুরী—

All things in common Nature should produce,
Without sweat or endeavour.

'পরিশ্রম আর প্রয়াসহীন, আলস্যের স্বর্গস্বপ্ন পেটি বুর্জোয়ারই নিজস্ব জিনিস।

কি জানি, বিশ্বপ্রকৃতির তালের বাইরে কি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারকা, পৃথিবীর জোয়ার-ভাঁটা, ঋতুচক্রের আবর্তন, বৃক্ষ লতাপাতার ফুটে-ওঠা আর ঝরে-পড়া, প্রাণী জগতের জন্ম-মৃত্যু বিকাশ ? কেবল মানুষেরই বেলা তার ব্যতিক্রম ? মানুষের উত্তম উদ্যোগ সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি ? না, The art itself is Nature.

কেমন উন্মনা হলেন ভদ্রলোক। আমি বুঝলাম যা বলেন আমাদের বন্ধুরা মিথ্যা নয়, বিভ্রান্ত পেটি বুর্জোয়া, স্ববিরোধী ভাবনায় ভরতি। তা ধরিয়ে

দেবার জন্যই বললাম : মানবীয় চেতনায়-উদ্যোগেই যে মানুষের পরিচয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এই কথা তো বুঝেছিলেন ?

তাও কি বুঝেছিলাম সম্পূর্ণ ?

না হলে বলতে পারতেন কি what a piece of work is man !

তিনি বলতে লাগলেন : how noble in reason ! how infinite in faculty !···তিনি বলে চললেন, আমি শুনতে লাগলাম। শেষ হলে বললাম ; ধরা পড়ে গেলেন। তাহলে আমাদের সম্পাদক যা বলে তা সত্য—আপনি কমিউনিস্ট নন, কমিউনিস্টদের গুরু।

কমিউনিস্ট—তিনি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন—বললেন : কেমন ?

আমাদের দিনে মানুষের সম্বন্ধে এসব কথা কমিউনিস্ট ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

সে কি ? মানুষের গৌরব মানে না ?

কি করে মানবে ? মানুষ যে নিঃসঙ্গ ; মানুষ যে পাপসম্ভূত, পাপপূর্ণ···

তিনি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ; বললেন : হলেই বা কি ? তবু মানুষ অদ্ভুত !

অর্থাৎ, আপনি কমিউনিস্ট।

এবার তিনি সকৌতুকে হেসে ফেললেন।

সত্য বলেছ, না হলে আমি জ্যাক ক্যাড-এর মতো তোমাদের গণবিপ্লবীর চিত্র আঁকি ? কোরিওলেনাস্ লিখি। নির্বোধ জনতার কাণ্ড দেখাই ?

সে আমাদেরও জানা আছে। আপনার মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব ছিল। তাই তো গোঁড়া বুর্জোয়ারা আপনাকে বলে ক্রিপটো কমিউনিস্ট। আবার বামপন্থী বন্ধুরা বলেন—নিছক পেটি বুর্জোয়া।

বলে তো ? যাক্, জানো যদি ওসবও মনে রেখো।

জান কেন ? বরাবর জানতাম তাই একমাত্র কথা। ছেলেবেলা থেকে আমরা শুনেছি আপনি জনতায় অবিশ্বাসী, অভিজাতদের অনুগৃহীত, রাজশক্তির আশ্রিত, রক্ষণশীল নাট্যকার। গদীয়ান্ সমালোচকেরা তখন বরাবর আমাদের তা বুঝোতেন। তবু দেখুন আমাদের সম্পাদকের মতো মানুষেরা গোল বাধিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আপনার ঐতিহাসিক নাটক থেকে তাঁরা শিখতেন দেশভক্তির মন্ত্র, স্বাধীনতার আদর্শ। চাইতেন ব্রুটাস্-এর মতো স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ—অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অবসান।

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে পড়লেন: সে আমি কি করব? আমি চেয়েছি দেশের সংহতি; প্রজার স্বস্তি। পঞ্চম হেনরির মতো রাজাই প্রজার গৌরব।

আমরা তাতে বুঝেছি—আমাদের রাজা নেই—স্বরাজে দেশের আশা। তারপর যত বয়স হল আপনার মতোই আমাদের চোখ দেখতে শিখল। দেখলাম দেশের জনসাধারণই দেশ—আপনার লেখাতেও তার চিহ্ন কম নেই। কোরিওলেনাস-এরই নাগরিকরা শোনাল···Our sufferance is gain to them (ঐ বড়লোকদের)···তারা Suffer us to famish, and their store-houses crammed with gain. If wars eat us not up, they will; and there's all the love they bear us. শ্রেণী সংগ্রাম আর কাকে বলে? তারও পরে রোমিও থেকে টাইমন অব এ্যাথেন্সের মুখে পর্যন্ত শুনলাম যা দেখছিলাম টাকায় সব হয়:

Gold? Yellow glittering precious gold?···
Thus much of this will make black, white, foul, fair;
Wrong, right, base, noble; old, young; coward valiant

বুঝিয়ে দিলেন—"cash-nexus" না মানাই অসম্ভব।

কি করব? যদি দেখতে লণ্ডনের তখনকার নতুন বণিক ব্যবসায়ীদের ইতরতা আর উৎকটতা।

তখন আর কী দেখেছেন, এখন দেখলে আরও বুঝতেন। এই সেদিনও যা ঘটল। আপনি আগেই তা আঁচ করতে পেরেছিলেন—তাই তো আমাদের কেউ কেউ আবার বলেন—আপনি তাদের কমিউনিজমের শিক্ষা দিয়েছেন।

আবার ভদ্রলোক বেশ বিড়ম্বিত বোধ করলেন: ছাখো, আমি নাটক লিখেছি। লোককে শিক্ষা দিতে বসি নি। নাটকের নিয়মে যা সত্য তা ঘটেছে।

নাটকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে সত্য আপনি দেখেছেন, আপনি বুঝেছেন। আর তাই আপনার কথা, আপনার শিক্ষা।

আমার শিক্ষা কেন হবে? নাটকের শিক্ষা। বরং বলতে পার জীবনের শিক্ষা—আমার যদি কিছু থাকে তা আমার জীবন।

ভদ্রলোক একটু জোর দিয়ে বললেন। আমি বললাম: নাটকে কি তা নেই?

থাকতে পারে, নাটকের নিয়মে পরোক্ষে। পরোক্ষ বলেই তো দেখছ তর্ক—তোমাদেরই মধ্যে।—আমি পেটি-বুর্জোয়া রক্ষণশীল, না, আমি জনতার বন্ধু, মানুষে বিশ্বাসী। কিন্তু জীবনটা প্রত্যক্ষ। তার সাক্ষ্য নিলে মতভেদ বেশি হত না। গরীব ঘরের ছেলে—ওই পেটি-বুর্জোয়া। কত কৌশলে দু-পয়সা উপার্জন করতে হয়েছে। থিয়েটার ছিল নেশা। হল পেশা। যেমন করে পারি নাটক জমাতে হবে। কীড স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির খুনাখুনি আর হুঙ্কারে তখন আসর মাত করছে। আমাদের থিয়েটার কেন পড়ে আর কি। লিখে ফেললাম ছ-ছটা খুনের নাটক—'হ্যামলেট'। লোক ভেঙে পড়ল থিয়েটারে। টাকা উপচে পড়তে লাগল—টাকাটা কি ফেলবার জিনিস? এমনি করে দু-পয়সা কামিয়েছি। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। জমিজেরাত কিনেছি; ভদ্রলোকের সরকারি তকমা আদায় করেছি; নিজের শহুরে-জীবনটা স্বচ্ছল ভাবে মান-সম্ভ্রম নিয়ে কাটালাম। এই আমার জীবনের জীবন্ত শিক্ষা।

অর্থাৎ আপনি জাত পেটি-বুর্জোয়া—জন্মেও যা, স্বভাবেও তা। আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা ঠিকই ধরেছেন। না হলে শহরে যখন থিয়েটারের মালিক হয়ে বসেছেন তখন থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে আসতেন না প্রোসপেরোর মতো বলে:

I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth.

আপনার প্রোসপেরোরও বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকের মতো উচ্চ সাধনা নেই—তাই বিজ্ঞান ত্যাগ করতে আপত্তি হল না।

তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—আমারও মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেছল—স্ট্রাটফোর্ডে জমি কিনেছি, বাড়ি কিনেছি, স্ত্রী-পরিবার নিয়ে এবার শান্তিতে থাকব।

'স্ত্রী-পরিবার'? সেই বুড়ী "railing wife"? এবার ভদ্রলোক আমার দিকে কৌতুকমিশ্রিত কৃপার দৃষ্টিতে তাকালেন।

ওই কথাটাই বুঝি তোমরা চূড়ান্ত বলে ধরে বসে আছ?

কেন, তা কি মিথ্যা? 'টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট' ও 'টেম্পেস্ট'-এ কি তারও আভাস নেই?

থাকুক। জীবনের মূল সাক্ষ্যটা তাতে বাতিল হবে না। তা ছাখো—এ্যান আমার থেকে আট বৎসরের বড়ো। কিন্তু আমার জীবনে সে প্রথম

নারী। তখনো তার বয়স ছিল, আমারও উঠতি বয়স। আমার জীবনে প্রেমের দেবতাকে সে প্রথম জাগায়। তার অর্থ বোঝ? সে-অভিজ্ঞতা অপূর্ব, দেহে-মনে অপুনরাবর্তনীয়। তারপরে, এ্যানও ছেলেমেয়ে নিয়ে বুড়িয়ে উঠেছে, সংসারের জ্বালায় উঠেছে তেতে ক্ষেপে। আমারও জীবনে এসেছে অনেকে—অনেক অভিজ্ঞতা। ফেলে দিই নি। যা নেবার মতো নিয়েছি। তখন my love is fever, তাতে কি? বুড়িয়ে-ওঠা এ্যানকে আমি তো ছাড়াতে চাই নি, উড়ে-বেড়ানো আমাকেও সে ছাড়ে নি। তারপর বয়স থিতিয়ে আসে, feverও ক্রমে নামে। তাপ তখন হয়ে যায় আলো। তখন বোঝা যায় প্রেমের মূল্য, তার অপরিমেয়তা।

হেসে একবার তিনি থামলেন। একটু পরে শান্তভাবে বললেন: একটা মাত্র ছেলে আমাদের—হ্যামনেট। সে গেল। বাড়ি ফিরে তখন দেখলাম এ্যানকে। নিজেও কম আঘাত পাই নি। কিন্তু মায়ের ব্যথার সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? তখন সত্যই এ্যান বয়স্কা। তারপর থেকে কেমন হয়ে গেল পুত্রশোকে। গুম হয়ে বসে থাকে। গৃহ-সংসারও দেখতে পারে না। মেয়ে-জামাইকেই দেখতে শুনতে হয় সব। তবু গৃহই আমার শেষ আশ্রম—আর এ্যান সেই গৃহিণী। অনেক সয়েছে, অনেক ভুগেছে। আমার যৌবনের প্রথম প্রেয়সী, আমার পরিণত প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গিনী। এ-কথার অর্থ বুঝবে যদি প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্ত শ্রী কী, তা বোঝো—যদি জীবনের পরিণতিতে আস্থা রাখো—

Men must endure
Their going hence even as their coming hither.
Ripeness is all.

প্রসন্নতায় ললাট উদ্ভাসিত, পরিতৃপ্তিতে মুখখানা সুস্নিগ্ধ, চোখে শান্ত সরসতা। একবারের মতো আমি ভুলে গেলাম—তাকিয়ে রইলাম। পরক্ষণেই চমকিত হলাম—এ কি। পরিণত জীবনের সাক্ষ্য? না, ওঁর পরিণত অভিনয়শক্তির প্রমাণ?

হঠাৎ শুনলাম: বিদেশী বন্ধু!—দেখি দাঁড়িয়ে ওঠে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—যাবে একবার আমার গৃহে? এ্যানকে দেখবে? কিছু cakes and ale-ও মিলবে? জানালায় দেখবে তাকিয়ে বসে আছে এ্যান! যাবে? দেখা হবে।

আমি হাতে হাত নাড়া দিতে দিতে বললাম: না। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বাধা হব না। তাঁকে আমার নমস্কার! আর আমাদের সকলের পক্ষ থেকে নমস্কার আপনাকে। কিন্তু শেষ কথাটা কী বলব আপনার? আমাদের একটা লাইন ঠিক করতে হবে তো আপনার সম্বন্ধে। আমাদের কাগজের জন্য আপনার বিশেষ কথা—

বললাম তো—

জিজ্ঞাসা করলাম কি? Ripeness is all?

তিনি হাসলেন। হেঁয়ালিভরা হাসির অর্থ কী তা বুঝবার আগেই দেখি বলছেন, নমস্কার!

পিছন ফিরে আর তাকালেন না। সন্ধ্যার আঁধারে হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা যেন মিলিয়ে গেল।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপীয়র অনুবাদের সপক্ষে

শেক্সপীয়র অনুবাদের অসম্ভাব্যতায় দৃঢ়নিশ্চয় এমন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙালীর দর্শন দুর্লভ নয়, যাঁদের কাছে এই মহাকবিকে অনুবাদ করার মতো পণ্ডশ্রম আর কিছু থাকতে পারে না। পণ্ডশ্রম এই জন্যে যে, যাঁরা ইংরেজী জানেন এবং মূলের রসাস্বাদন করতে পারেন, অনুবাদ তাঁদের কাছে মূলের দুর্গতির স্মারক মাত্র। এবং যারা ইংরেজী জানেন না, সেই অপাংক্তেয়দের জন্যে ভাবনার কারণ নেই, যেহেতু তাদের কাছে শেক্সপীয়রও যা মুচিরাম গুড়ও তাই। কোনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশীয় বা জাপানীর মুখ থেকে অনুবাদ না করার এইরূপ যুক্তি কল্পনাতীত; তার একমাত্র কারণ, তারা তাদের ভাষার সঙ্গে অদ্বৈত। আমাদের কাছে আমাদের ভাষাটা নিতান্তই মাতৃভাষা; তাই তার স্থান অন্দরমহলে, মায়ের আঁচলে বাঁধা। আফিসে, কাছারিতে, বহির্জগতের কর্মকাণ্ডের সব ক্ষেত্রে আজও সেই ভাষাকে ঘোমটা টেনে চলতে হয়, যদিও আইনত এই ঘোমটা খুলে ফেলার অধিকার সে অর্জন করেছে। জন্মগত অধিকারকে যখন আইনের জোরে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, তখন সে-অধিকারে ন্যায়বিচার থাকলেও, ব্যবহারের সহজাত স্ফূর্তি থাকে না। ইংরেজ বা ফরাসী কল্পনাই করতে পারে না, তাদের ভাষার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাদের কোনো অস্তিত্ব আছে। ভাষার প্রতি এই মমত্ব, এ বিধিবদ্ধ কোন অধিকার নয়, এ তাদের সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই তারা পরকে আপন করে সাজাতে জানে, আপনকে দূরে ঠেলে গৌরববোধ করে না। তাই ফরাসী, জার্মান, রুশীয়রা যখন নিজেদের ভাষায় শেক্সপীয়রকে অনুবাদ করে অভিনয় করে, তার দ্বারা এই প্রমাণিত হয় না, তাদের রসবোধ আমাদের মতো উন্নত নয়, তার দ্বারা প্রমাণ হয় তারা মূলের ততটুকু রসাস্বাদনেই তৃপ্ত যতটুকু তাদের ভাষা তাদের কাছে পৌছিয়ে দিতে পারে। এ-কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মূলকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করার শক্তি কোনো

ভাষারই নেই। তবু, স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত রেখে ভিন্নভাষী পাঠক অনুবাদককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রাখে। ভাষার এই বাহিকশক্তিকে অধিকার করা সহজ কাজ নয়। এইজন্যে এইসব দেশে অনুবাদ মৌলিক সাহিত্যের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং দেশের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরা অনুবাদকে মূলানুগ করার কাজে ব্যাপৃত। তাই শেক্সপীয়রের এই চতুর্থ শতবর্ষ উদ্‌যাপনের লগ্নে, পৃথিবীর সবদেশ যখন শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা স্মরণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, তখন আমরা তাঁকে মহাকবি বলে শ্রদ্ধা জানালেও, আত্মীয় বলে ভাবতে দ্বিধান্বিত। তা এই চতুর্থ শতবার্ষিক শ্রদ্ধা-অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড থেকেই বোঝা যায়। আমাদের গবেষকরা বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে শেক্সপীয়রের ছিটেফোঁটা যদি কোথাও পাওয়া যায় তার সন্ধানে ব্যাপৃত, যাতে, বৃষোৎসর্গ না হলেও, অন্তত তিলতর্পণটুকু করা চলে। অন্যদিকে শেক্সপীয়র অভিনয়ের উৎসাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় মূল ইংরেজীতে, নয়তো অপ্রচলিত কোনো প্রাচীন অনুবাদে সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদের প্রচেষ্টার কথা। ১৯৫১ খৃঃ মুখ্যত শ্রদ্ধেয় নীরেন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহে এবং শেক্সপীয়র-উৎসাহী বিদ্বজ্জনের সহযোগে এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রায়ের বিদেশ গমনের পূর্ব পর্যন্ত, পরিষদ কলকাতার নাট্যামোদী মহলে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে, তা যদি অদ্যাবধি বজায় থাকত, তাহলে এতদিনে বাঙলায় শেক্সপীয়র অনেক বেশি সুগম হত। প্রতি বৎসর শেক্সপীয়র-দিবস পালন, শেক্সপীয়র নাটকের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ, শেক্সপীয়র সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা ছাড়া, এ কালে বাঙলায় শেক্সপীয়রীয় নাটক অভিনয়ের প্রাথমিক কৃতিত্ব পরিষদের প্রাপ্য। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য লিটল থিয়েটার সম্প্রদায়। তাঁরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আধুনিক রুচিসম্মত বাঙলা ভাষ্যে শেক্সপীয়রের নিয়মিত অভিনয় করে এবং নাট্যরসিক বাঙালী দর্শকের সঙ্গে সেই নাট্যপ্রতিভার নতুন ভাবে যোগসাধন করছেন।

অথচ ১৮৬৪ খৃঃ শেক্সপীয়রের তৃতীয় শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় তুর্গেনিভ রুশবাসীর জীবনে শেক্সপীয়রের প্রভাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে যদি বলে থাকেন: "শেক্সপীয়র আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য" তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই সেই কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে পারত: "he has become part of our way of life." মুখ্যত

ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের জাদুস্পর্শে শিক্ষিত বাঙালীর মানসদিগন্তে যে বিস্তার ও বর্ণালির উদ্ভাস দেখা গিয়েছিল, তা মরুমায়া হলেও, তার মধ্যেই এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের দুর্ধর্ষ জীবনসর্বস্বতা কিছু পরিমাণে তাদের স্পর্শ করেছিল। সেই আবেগের জোয়ারে তারা এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের বাসিন্দা হয়ে গেল। তাদের পরনে ইংরেজী পোশাক, তাদের আচারে আচরণে ইংরেজী কেতা, তাদের মুখে ইংরেজী বুলি। শেক্সপীয়র, মার্লো, বেকন তাদের নিত্যসহচর। তাদের জীবনটাই অভিনয় হয়ে উঠল, অভিনয়ে কখনো তারা এসেক্স, কখনো র‍্যালে, কখনো সাদাম্‌টন বা মার্লো, কখনো বা হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, লিয়র বা শাইলক। শিক্ষিত বাঙালীর সে-স্বপ্নাবেশকে বোধহয় শেক্সপীয়রকে ভালোবাসা বলা চলে না। ভালোবাসার মধ্যে নিজের সত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকে, তা ধারণ করে, হারিয়ে যায় না। এই স্বপ্নাবিষ্ট লোকগুলোর আসল প্রকৃতি কিন্তু খাঁটি বাঙালীর। তাই সুস্থ মস্তিষ্কে যখন তারা নিজেদের কথা বলতে চেয়েছে কিংবা শেক্সপীয়রকে ধারণ করতে গিয়েছে, তখন তাদের যে বিশুদ্ধ বাঙালী মূর্তি দেখি, তাতে সন্দেহ থাকে না, তাদের ইংরেজ চেহারা অভিনয়ের সাজ মাত্র। স্বপ্নপ্রয়াণই বলি, অভিনয়ই বলি, এর ফলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কম লাভ হয় নি। সেই স্বপ্নের স্মৃতিতে তারা নিজেদের জীবনে শেক্সপীয়রীয় জীবনছন্দের অনুরূপ প্রকাশরূপ খুঁজতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। এরই অন্যতম নিদর্শন, এই উগ্র ইংরেজিয়ানার যুগে শেক্সপীয়রের নাটককে বাঙলায় অনূদিত করার প্রয়াস। এবং বোধহয় এক হিসেবে সেকালের বাঙলা ভাষায় এই জীবনবোধের অনুকূল একটি সরল ও খাঁটি বাংলা সুর ছিল। আজকের অত্যধিক পরিশীলিত বাংলা ভাষায় সেই সব জীবন্ত শব্দ অশালীন, গ্রাম্য ও অসভ্যবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। তখনকার অনুবাদ থেকে এইরকম কিছু শব্দ যথেচ্ছভাবে তুলে দিচ্ছি :

> "আঁদার-পাঁদাড় ; ঘাপটি মেরে ; খোদার নাম নিয়ে বদিয়াতি, আখেরী নরক ; উগ্‌রে ঝেড়ে দিয়েছে।
>
> (ম্যাকবেথ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত)
>
> রেগেছি কি হেতের চেলেছি ; হেকমৎ তো ভারি ; ওস্তাদি চাল ; হাতের লাঙ্গা তলোয়ার ; তোর গুষ্ঠির মুখে থু ; ঠ্যাঙ্গা ; মার, হাড় পিষে দে।
>
> (রোমিও-জুলিয়েত : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত)

এই শতকের প্রথম ভাগেও এই ধরনের শব্দ নাটকে প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বসুকৃত 'ওথেলো' অনুবাদে (১৯১৯) ইয়াগোর মুখের কয়েকটি কথা :

> 'লাট দেমাকে খাতির নাদার', 'গুণের ভেতর সুন্দরীর নাগরীর নাগর', 'ঝিউড়ি ছুঁড়ি', 'এই অজ মুহুরী পাল ভরে উঠলেন বন্দরে,' 'গোলামির ঝকমারি', 'মতলব হাসিল', 'সেলাম বাজালেন', 'নেমকের গোলাম', 'ছাঁদন দড়ি যেন গলার হার,'

তৎসত্ত্বেও শেক্সপীয়রকে বাঙলা অনুবাদে সার্থকভাবে ধরা যায় নি। এর কারণ প্রধানত দৈনন্দিন ব্যবহারে এই ভাষার সীমাবদ্ধতা। যার ফলে মূলের সেই সব চরিত্র সেকালের অনুবাদে সহজেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যাদের মধ্যে জীবনের জটিল দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত এবং যাদের জীবনচক্রে কাব্য প্রায়শই অস্পৃষ্ট। যেমন, 'ম্যাকবেথ'-এর ডাইনী, দ্বারপাল, 'রোমিও-জুলিয়েত'-এর ধাই বা ভৃত্যরা, 'জুলিয়াস সীজর'-এর পুরবাসীরা, 'ওথেলো'র ইয়াগো, রডারিগো, এমিলিয়া। এরা মাটির কাছাকাছি থাকে, মাটির মালিন্যও যেমন এদের অঙ্গে, তার সঞ্জীবনী শক্তিও এদের সত্তায়। প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, ভাঁড়ামি, নানা গ্রাম্য রসিকতা ও বাক্‌রীতি-সমৃদ্ধ লৌকিক ভাষা এইসব সংসারী মানুষগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। এদের বাচনিক রূপায়ণে মূলে যদিও গদ্যপদ্যের কোনো বাচবিচার করা নেই, সেকালের বাঙলা অনুবাদে এরা একান্তভাবে গদ্য সীমানাভুক্ত, পদ্যের অভিজাত মহলে তাদের গতিবিধি ছিল নিষিদ্ধ। হয়তো শিক্ষিত বাঙালীসমাজের তদানীন্তন পটভূমিতে শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিক চরিত্রের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জীবনরহস্য অবধারণ করার মতো মানসিকতার অভাব ছিল, সেই কারণে তাদের জীবন্ত ভাষার সঙ্গে সেই ভাবের আত্মীয়তা তাদের কাছে অসঙ্গত মনে হয়েছে। এবং এই অনাত্মীয় ভাববস্তুর সঙ্গত রূপের সন্ধানে তারা মধুসূদনের সংস্কৃত-বহুল কৃত্রিম ভাষাকে গ্রহণ করল। কিন্তু মধুসূদনের আদর্শ ছিল গুরুগম্ভীর কাব্যিক ভাষায় মিল্টনের কাব্য ও ধ্বনিগাম্ভীর্য, শেক্সপীয়রের বিচিত্র সুরসঙ্গতি নয়। এই খণ্ডিত মানসিকতায় ও দ্বিধাগ্রস্ত ভাষায় শেক্সপীয়রীয় জীবনের সহজ সরল অন্তজ প্রকাশ থেকে নৈর্ব্যক্তিক কাব্য ও দর্শনের তুঙ্গলোক পর্যন্ত আরোহণ অবরোহণের সাবলীলতা অসম্ভব ছিল। মনে হয়, নিত্য ব্যবহারের জীবন্ত ভাষাকে অসাধু জ্ঞানে কাব্যের অচ্ছ্যুত বলে গণ্য না করে, তাই দিয়ে বাঙালী জীবনের উঁচু-নিচু, সরল, জটিল, কাব্যিক ব্যবহারিক সব

স্তরের প্রকাশরূপকে ধারণের প্রয়াস তখন থেকে করলে, আজ শেক্সপীয়রীয় অনুবাদ-চর্চা অনেক সহজ হতে পারত। মধুসূদন চলিত কথাভাষাকে অমিত্রছন্দে ধরবার কোনো দৃষ্টান্ত রেখে গেলে, পরবর্তী নাট্যকারেরা, শুধু শেক্সপীয়র অনুবাদেই নয়, মৌলিক নাট্যরচনায়ও জীবনের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে পারতেন। প্রসঙ্গটা এত বেশি করে বলার কারণ এই, শেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রের, রূপকথা, ইতিহাস পুরাণ, যেখান থেকেই আসুক না কেন, তারা যে-কথার জাদুতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই-কথা প্রধানত ইংলণ্ডের দেশজ Anglo-Saxon শব্দ ভাণ্ডার থেকে আহরিত। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে তিনি তদানীন্তন ইংলণ্ডের সব স্তরের ভাষার উপাদানকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছেন। কথাশিল্পী যদি কথার সব রঙের ব্যবহার না করতে পারেন তাহলে তাঁর শিল্পসৃষ্টি পঙ্গু হতে বাধ্য। মনে হয়, পদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করে নিছক চলিত গদ্যেও যদি শেক্সপীয়র বাঙলায় অনূদিত হত তাহলেও নাট্যোৎসাহী বাঙালীসমাজে শেক্সপীয়র অনেক বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারত।

শেক্সপীয়রীয় অনুবাদ-ব্যর্থতার কারণ আরও মৌলিক হতে পারে। যে দেশ-কাল সমাজের রূপশিল্পী শেক্সপীয়র তার কোনোটাই আমাদের সংস্কারে নেই। ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য প্রায় সব দেশেরই সংস্কারগত আত্মীয়তা কিছু না কিছু আছে। তাই যে কোনো ইওরোপীয় ভাষায় শেক্সপীয়র সজ্জিত হতে পারেন, তাতে তাঁর নাট্য-ব্যক্তিত্বের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু বহুযুগাগত আচারব্যবহার রীতিনীতির এমন একটা পাকাপোক্ত সংস্কারের প্রাচীর আমাদের এই প্রাচ্য সমাজকে ঘিরে রেখেছে যে তার মধ্যে শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের অবাধ চলাফেরা সম্ভব নয়। যারা শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে এমনি শুচিবাইগ্রস্ত বলে মনে করেন, তাঁরা ভুলে যান, শেক্সপীয়রের অধিকাংশ চরিত্রই এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের নয়। তারা রোম, গ্রীস, ফ্রান্স, ইটালি, ইজিপ্ট, আরব, সিসিলি, ডেনমার্ক, নরওয়ে—নানা দেশ নানা কাল থেকে এসে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের অধিবাসী হয় নি, সব দেশ সব কালের অধিবাসী হয়েছে। হ্যামলেট, ওথেলো, ক্লিওপেট্রা, শাইলক, কোরিওলেনাস, সীজর, টাইমন, ট্রয়লাস—ইংলণ্ড যদি এদের আত্মীয় বলে দাবি করতে পারে, বাঙলা দেশ বা কেন পারবে না। সেকালে রামায়ণ মহাভারতের কোনো অনুবাদ যদি শেক্সপীয়রের

হাতে পড়ত, তাহলে, কে জানে, আমাদের রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-অর্জুন হয়তো, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, ইংলণ্ডের বাসিন্দা হয়ে যেত। অভিনেয় নাটকে পট ও সাজ বদলের প্রয়োজন থাকলেও মানবিক যোগসূত্রটি কখনো হারিয়ে যায় না। বাংলা নাটকের চরিত্ররাই বা কি কৌলিকভাবে সবাই বাঙালী? বহু অবাঙালীর বাঙালী হওয়া আমাদের নাট্য-ঐতিহ্যে যখন স্বীকৃত, শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের পক্ষে তা সম্ভব হবে না কেন?

শিল্পদৃষ্টির সর্বজনীনতায়ও এ যুক্তি অকাট্য নয়। এ-কথা অনস্বীকার্য, ভাষা, ছন্দ, রূপকল্প ও ভাবব্যঞ্জনা, সব মিলিয়ে মূল কাব্যে 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' যে অনন্যানুভূতি ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে, তাকে মূলের ভাষারূপ থেকে পৃথক করা সহজসাধ্য নয়। এই কাব্যব্যঞ্জনা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় দৃষ্টান্ত মনে পড়ে, "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" সামান্য চারটি শব্দে শ্রাবণের অবিরাম ধারাপাতের যে তন্ময় আবিষ্টতা ফুটে ওঠে, ইংরেজীতে তার কিছুটা আভাস হয়তো মেলে সিগ্রফ্রিড সাসুন-এর এই দুই ছত্রে :

a trickling peace
Gently and slowly washing life away.

ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও সাসুন-এর কবিতার রসাস্বাদন করতে পারি; 'জল পড়ে' ও সাসুন-এর কবিতা দু-এরই আবেদন আমাদের কাছে পৌঁছোয়। অনুবাদ যদি এমনি কোনো রূপশৈলীর চর্চা না করতে পারে, যার দ্বারা এক ভাষার আবেদন অন্য ভাষায় অনুরূপ আবেদন সঞ্চার করে, তাহলে আমাদের অক্ষমতাই দায়ী। কাব্যতীর্থে সব মন্দিরেই সবার অবাধ গতি, সেখানে অছ্যুত কেউ নেই। আত্মনিয়োগ করলে, অনুবাদ, এমনকি শেক্সপীয়র অনুবাদ কত সার্থক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং তাঁদের পরে আরো অনেক প্রখ্যাত আধুনিক কবির অনূদিত শেক্সপীয়রের সনেট। কাব্য যখন একান্তভাবে স্বগত ভাবব্যঞ্জনা, যেখানে ঘটমান স্থূল জাগতিক জীবনের হিংসাদ্বেষ লাভক্ষতির হানাহানি থেকে প্রত্যক্ষত তা মুক্ত, সেই আত্মনিমগ্ন ধ্যানের জগতে আধুনিক বাঙালী কবি স্থানকালের ব্যবধান অনায়াসে লঙ্ঘন করে যদি অনুপ্রবেশ করতে পারেন, তাহলে শেক্সপীয়রের নাটকের ক্ষেত্রে, যেখানে কাব্য থাকলেও তা জাগতিক ঘটনা সংঘাতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, অনুবাদকার্য অপেক্ষাকৃত সহজ হতে বাধ্য। আধুনিক কবিরা নাটকের অনুবাদের কাজে হাত দেন নি বলে

একথা বলা যায় না, তা তাঁদের ক্ষমতাতীত, হয়তো মজুরি না পোষানোর নেহাত একটা আধিভৌতিক কারণে এ-কাজে তাঁরা নিরস্ত থেকেছেন। অধুনা শিক্ষিত বাঙালীসমাজে নানা কারণে নাটক সম্পর্কে সেই প্রাচীন উৎসাহ স্তিমিত বলেই অনুবাদ-প্রয়াসের এই মন্দাভাব। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, উনিশ শতকে, যখন শেক্সপীয়রের নাটক শিক্ষিত বাঙালীসমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল, তখন শেক্সপীয়রের নাটক অনুবাদ করার আন্তরিক ও আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদের কেউ চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা নেই। এমনকি রবীন্দ্রযুগেও কোনো প্রথম শ্রেণীর কবি শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদে যদি হাত দিয়ে থাকেন তাও সুবিদিত নয়। যখন ভাষার আধার তৈরি হয় নি, তখন নাটক-অনুবাদই অপেক্ষাকৃত সহজ বলে, (অবশ্য, নাটকের জনপ্রিয়তাও অন্যতম কারণ) তাতেই তদানীন্তন বাঙালী কবিদের যাবতীয় প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শেক্সপীয়রীয় সনেটের জীবনাঙ্গ গদ্যভঙ্গি বাঙলায় তখনো অনাবিষ্কৃত। এবং, আমার অনুমান, যে কারণে সনেটের অনুবাদ হয় নি, সেই কারণে হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়র, ম্যাকবেথ-এর মতো ট্রাজিক চরিত্রের ভাবসংক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলি—যা কাব্যিক বিচারে সনেটের সমগোত্রীয়—অনুবাদে ধরা যায় নি। কাব্যে গদ্যভঙ্গির আবির্ভাব কালসাপেক্ষ। সংহত-আবেগ গদ্যিকতা যে মানসিক বয়স্কতায় সম্ভব রবীন্দ্রোত্তর কালের আগে যদি তার সন্ধান ব্যর্থ হয়, তার দ্বারা এই প্রমাণ হয়, আমাদের বয়োপ্রাপ্তির তখনো বিলম্ব ছিল।

শেক্সপীয়রের অনুবাদের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি স্মরণ করি :

> "বাঙলা জীবন্ত ভাষা : এবং সেইজন্যে গ্রামে জন্মে, শুধু সংস্কৃত কেন, আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দু, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতির কাছে নিঃসঙ্কোচে হাত পেতে, সে আজ নগরেও অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাকে ভাবনার নূতন প্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ।"
>
> (প্রতিধ্বনি : ভূমিকা)

এই উক্তি শিরোধার্য করে শেক্সপীয়র অনুবাদের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার

পরিপ্রেক্ষিতে অনুবাদের নীতিরীতি ও কার্যকালিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, যেহেতু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়, আমার প্রথম অনুবাদ 'দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এ অনুসৃত অনেক রীতি আপাতত অবান্তর ও পরিত্যাজ্য মনে হয়েছে। তেমনি 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অনুবাদে এলিঅট-এর 'a caesura and three stresses' অনুকরণে বাচনভঙ্গির সঙ্গে ছন্দকে মেলাতে গিয়ে যে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি, তাও এখন মনে হয়, স্বাধীনতার অপব্যবহার। পরবর্তী আলোচনায় আমার সাম্প্রতিক অনুবাদ * 'ওথেলো'র অভিজ্ঞতা এবং সেই অনুবাদে অনুসৃত পদ্ধতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব বেশি আছে।

(ক) গঠনগত সাদৃশ্য

মূলের সঙ্গে পংক্তি মিল ও গঠনগত সৌসাদৃশ্য বজায় রাখার সমর্থনে দি 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অনুবাদ প্রসঙ্গে দশ বৎসর আগে যা বলেছিলাম, এখন তা শুধু স্বীকার করা নয়, আরও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করি। আগে বলেছিলাম :

> "মূলকে বিকৃত করার প্রতিবাদ হিসেবেও এই নীতি অনুসরণযোগ্য। এ সবের চেয়ে বড় কথা ক্লাসিক পর্যায়ের কাব্য বা নাটক এমনি একটি আধার যার মধ্যে সমসাময়িক সংস্কৃতি শুধু প্রকাশমূর্তিই পায় না, ছন্দও পায়। অনুবাদ করতে হলে কাব্যের এই ব্যক্তিত্বকে ধারণ করার দরকার হয়। এই ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভাষার আধারে সমছন্দের প্রকাশরূপ খুঁজে নেয়।···
>
> সমভঙ্গির প্রকাশরূপের প্রয়োজনীয়তা কাব্যে যদি থাকে, নাটক অনুবাদে আরো বেশি করে থাকবে। কারণ নাটকের আদ্যন্ত নাট্যকারের ভঙ্গি তো আছেই, সেই ভঙ্গি আবার প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিত্বে বিশ্লিষ্ট হয়ে বিশিষ্টভাবে রূপায়িত। এই বৈশিষ্ট্যও স্থির নির্ধারিত নয়, পরিবেশের পরিবর্তনে তারও রং বদল হয়। সবটা মূল নাটকের সামগ্রিক ছন্দে বিধৃত, সেখানে প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি বিরতি ব্যক্তিত্বের জটিল গ্রন্থির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা।···একটা উদাহরণ সহজেই মনে পড়ছে—হ্যামলেটের তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তি "A little more than

* প্রকাশের অপেক্ষায় এবং 'এক্ষণ' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত।

kin and less than kind." এক পংক্তিতে অনুপ্রাসিত এই তীক্ষ্ণ শ্লেষ হ্যামলেটের ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক।…অনুবাদে…এই ছাঁদ বর্জন করলে, এমনকি অনুপ্রাসের অন্তর্নিহিত শ্লেষটা এড়িয়ে গেলে, হ্যামলেটের ব্যক্তিত্ব সম্যক ফুটে উঠবে না। একক পংক্তির ওই যতিগত পরিমিতিটা চরিত্রোপযোগী বলেই স্বীকার্য।"

[সাহিত্যপত্র—শ্রাবণ, ১৩৬০]

নাটকে কথা সূত্র, সেই সূত্রে নাটকের ঘটনা চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মূল নাট্যবস্তুর ক্রমিক উন্মেষ বিধৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ওথেলো নাটকের তৃতীয় অঙ্কে temptation scene-এর মূল নাট্যসূত্রটি 'When I love thee not, chaos is come again.' ওথেলোর উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হওয়ার পর ইয়াগো পর পর প্রশ্নের আঘাতে সেই মূল স্বরটাকে ছিন্নভিন্ন করে যে-রকম দ্রুতগতিতে নাটকের action-কে chaos-এর দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তা এক বা দুই শব্দ পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার তীক্ষ্ণ ও ত্বরিত প্রক্ষেপেই সম্ভব। মাত্রাবদ্ধ এই শব্দবাণগুলি প্রশ্নোত্তরের ঠাসবুনানীতে ছাড়া মাত্র কুড়ি পঁচিশ পংক্তির পরিসরে ওথেলোর মনের আকাশে সন্দেহের কালো মেঘ ছেয়ে দিতে পারত না।

অনুবাদে মূলের গঠনসাদৃশ্য বজায় রাখার প্রয়োজন সম্পর্কে রুশদেশীয় বিশেষজ্ঞ মিখাইল এম. মোরোজোভও কবি পিটার ওয়েইবর্গকৃত 'ওথেলো'র রুশ অনুবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন।

"The first thing that occurs to you about this translation is that it is much too long, much longer than the original, longer in fact by one fifth. This slows down the tempo of action.…This danger was first of all taken into consideration by our translators. Many of our new translations of Shakespeare are equilinear."

[Shakespeare on the Soviet Stage. p. 19]

এই একটি কারণেই অনুবাদের অবাধ স্বাধীনতা অমিতাচারে পর্যবসিত হতে পারে। ছন্দিত কাব্যের সীমাকে মেনে চলার দায় না থাকায়, চরিত্রেরা অত্যধিক প্রগলভ হয়ে নাটকের action-এর সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলতে পারে।

(খ) ছন্দ

সমপংক্তিকতা মেনে নেবার পর প্রশ্ন থেকে যায় ছন্দের কোন আধারে শেক্সপীয়র বিবৃত হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই হয়তো মনে পড়ে—গৈরিশ ছন্দের কথা। কিন্তু গৈরিশ মুক্তক ছন্দে ধ্বনির উচ্ছ্বাস, যতির আকস্মিকতা, অনুপ্রাসের বহুলতা শেক্সপীয়রীয় জীবনভাষ্য ধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিষয়ে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"গিরিশ বুঝলেন, মাইকেলকে অনুসরণ করে তাঁর ছন্দে নাটককে রূপ দেওয়া যাবে না। শেক্সপীয়রের ছন্দকেও বাংলায় রূপ দেওয়া গিরিশ সহজসাধ্য বলে মনে করলেন না।"

[বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, পৃঃ ১৩, আধুনিক বাংলা ছন্দে উদ্ধৃত]

শেক্সপীয়রের নাটকে ছন্দ থাকে প্রচ্ছন্ন, বাচনিকভঙ্গির অন্তর্প্রবাহে বয়ে চলে। অর্থাৎ পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিকের নিয়মিত দোলা অতি স্পষ্ট নয়, অথচ নাটকের গদ্যের থেকে একটা পার্থক্য থেকেই যায়। বাঙলাতেও ছন্দকে বাচনভঙ্গির সঙ্গে মেলানো দরকার। এ বিষয়ে আমার মনে হয়েছে:

"ইংরেজী পঞ্চপর্বিক আয়ম্বিক ছন্দের সঙ্গে বাঙলা মহাপয়ারের ভঙ্গিগত একটা সামঞ্জস্য আছে।…সাধারণ অমিত্রপয়ারের আট-ছয় অক্ষরের চরণের চেয়ে মহাপয়ারের বিস্তার (ও প্রবহমানতাকে) শেক্সপীয়রীয় মূলের গাম্ভীর্য ও নাটকীয় গদ্যানুগত্য বজায় রাখার পক্ষে বেশি উপযোগী মনে হয়েছে।"

[ibid]

(গ) ভাষা: চলিত কথ্য ভাষার সপক্ষে

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত অভিনেয় নাট্যকাব্যের যে সংস্কার চলে আসছিল, ভাষাগতভাবে তার প্রধান দুর্বলতা ছিল: নামধাতু কণ্টকিত সাধু-চলিত ভাষার একত্র ব্যবহার, সর্বনামের তারতম্য লোপ, একান্তভাবে পদ্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ। যদিও এককালে এই দুর্বলতাগুলিকেই কাব্যিক ভাষার বিশেষ সুবিধা এবং এই ভাষাকে শেক্সপীয়র অনুবাদের পক্ষে উপযোগী বলে মনে হয়েছিল, আমার এখনকার দৃঢ় অভিমত ওই ভাষা কাব্যনাটকে আপাতত অব্যবহার্য। আমার এই মত পরিবর্তনের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে।

(১) প্রাচীন কাব্যিক রীতিতে একই চরিত্র গদ্য থেকে পদ্যে কথা কইলে মনে হয় না চরিত্রের ভাবলোকের পট পরিবর্তন হচ্ছে। মনে হয় দুই বিভিন্ন চরিত্র কথা কইছে। চারিত্রিক সঙ্গতির দিক থেকে গদ্যে পদ্যে এক কথ্যরীতি গ্রাহ্য। সাধারণ কথা বলার ভাষায় আমাদের জীবনের আবেগসংক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলি যখন ধরা পড়ে, তখন নাটকে সেই ভাষার সর্বাঙ্গীন ব্যবহার কেন চলবে না, বিশেষত যখন নাটকের ভাষা কথোপকথনের ভাষা।

(২) সাধারণত হয়তো বলা চলে নাট্যকাব্য সমসাময়িক কবিতার বাচনভঙ্গি অনুকরণ করে চলে। রাবীন্দ্রিক কবিতার নাট্যভাস্য তাই ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত বেমানান হয় নি। কিন্তু তার পরের যুগের কবিতার বাচনভঙ্গির বদল হয়েছে। কথা বলার ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ভাষা এক হয়ে আসছে। এ শুধু স্বাভাবিক নয়, ভাষার স্বাস্থ্য ও সজীবতার লক্ষণ।…ইদানীংকার কবিতার সুর সংহত, তার গঠন আঁটসাট, তার গতি অনেক বেশি মন্থর। আটপৌরে বাকভঙ্গিকে কাব্যিক রূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। আধুনিক এই কাব্যিক রূপের প্রতিচ্ছায়া যদি নাটকে দেখতে হয়, তবে স্বভাবতই আধুনিক বাকরীতি অনুযায়ী ছন্দোবদ্ধ ভাষার প্রয়োজন।

(৩) আমাদের বাচনিক ভাষার সঙ্গে নাটকের ভাষার সঙ্গতি না থাকলে, সেই কৃত্রিম ভাষা নাটকের বিষয়বস্তুকে অবাস্তব দূরত্বে নিয়ে যায়। মানবিক জীবনসংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এইজাতীয় নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না। পুরাণ, রূপকথার, কাল্পনিক জগতের চরিত্র সেই জগতেই থেকে যায়, তারা বাস্তব জগতে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে মিশে যায় না যেমন মিশে যায়, হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র। নাট্যকাব্যে তাই ইতিহাস, পুরান, রূপকথা—সবকিছু বর্তমানের ভাষ্যে গ্রাহ্য। এ বিষয়ে শেক্সপীয়রই আমাদের গুরু। অতএব আধুনিক কথ্যভঙ্গিতে শেক্সপীয়রকে সাজালে নিশ্চয় সেই প্রতিভার অবমাননা হবে না।

(৪) মূল নাটকে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে যেখানে পদ্য মাত্রই কাব্য নয় এবং সাদামাটা আটপৌরে কথাও পদ্যের ছাঁদে বলা হয়েছে। যেমন 'ওথেলো' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ইয়াগো ও রোডারিগোর কথোপকথন :

রোডা : থাক আর কয়ো না কথা ; আমার টাকার থলি নিয়ে
যা খুশি করেছ তুমি ; অথচ, ইয়াগো, তুমি আগেই
এ সব জানতে ; খুবই মর্মাহত আমি।

ইয়াগো : জান কবুল, কিন্তু তুমি শুনবে না তো কোনো কথা ;
এমন ঘটনা যদি কখনো স্বপ্নেও জেনে থাকি এ মুখ দেখো না আর।

আমার ধারণা মূলেও এই কথ্যভঙ্গি আছে। যেমন :

Rod. Tush, never tell me, I take it much unkindly
That thou, Iago, who hast had my purse,
As if the strings were thine, shouldst know of this.

Iago. 'Sblood, but you will not hear me,
If ever I did dream of such a matter,
Abhor me.

এই অংশ কাব্যিক ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এরকম দাঁড়ায় :

রোডা : করিও না বৃথা বাক্য ব্যয়, মোর অর্থ লয়ে তুমি
করিয়াছ ইচ্ছামত ব্যয়, অথচ তোমার ইহা
পূর্বেই গোচরে ছিল ; অতি মর্মাহত আমি।

ইয়া : ঈশ্বর দোহাই কিন্তু কর্ণপাত করিবে না জানি,
এরূপ ঘটনা মোর স্বপ্নেরও গোচর যদি হয়
করিও না এ মুখ দর্শন।

মূলের সাধারণ গল্পিক বাক্যালাপের আমেজ এতে ফোটে না।

(৫) প্রাচীন কাব্যরীতির অপ্রাকৃত পরিবেশে নাট্যচরিত্র যে কাব্যমূর্তি পরিগ্রহ করে তাতে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ম্লান হয়ে যায়। যেমন ডেসডিমোনা ও এমিলিয়া, এই দুই নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কথ্য ভঙ্গিতে যেমন ফুটে ওঠে, অন্য কোনো ভাবে তা সম্ভব নয়। এমিলিয়ার একটা উক্তি নিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। পুরুষজাতি সম্পর্কে তার মন্তব্য।

'Tis not a year or two shows us a man :
They are all but stomachs, and we all but food ;
They eat us hungerly, and when they are full,
They belch us.

অনুবাদে :

"ছ-এক বছরে আমরা পুরুষকে চিনতেই পারি না।
তারা শুধু পেট-ভরা লোভ, আমরা শুধুই খাদ্য,
হাভাতেরা আমাদের গেলে, পরে, পেট পুরে গেলে,
দেয় উগরিয়ে।" (৩য় অঙ্ক, ৪ দৃশ্য লাঃ ১০০-১০৪)

এইসব অসংস্কৃত অভব্য শব্দের উৎপাতে পণ্ডিতদের পরিশীলিত কর্ণপটাহ হয়তো কিছুটা পীড়িত হতে পারে, কিন্তু নাটকের চরিত্র নিজের ছাড়া আর কারও মুখ রক্ষা করতে বাধ্য নয়। এই ধরনের উক্তি ডেসডিমোনার মুখে অচিন্তনীয়। ধরা যাক, এই উক্তি কাব্যিক মার্জিত ভাষায় রূপান্তরিত করা গেল :

"ছু এক বৎসরে মোরা পুরুষেরে চিনিবারে নারি,
উদর সর্বস্ব তারা, মোরা শুধু খাদ্য তাহাদের।
লুব্ধভাবে ভুঞ্জিয়া মোদের যবে আকণ্ঠ পূরিত হয়
তখন উগরি দেয়।"

এতে এমিলিয়ার ব্যক্তিত্বের ঝাঁঝ নেই এবং এ উক্তি ডেসডিমোনার মুখে অশোভন হত না।

কাব্যরীতির সর্বজনীন সাম্যে ব্যক্তিচরিত্রের অনন্যতা ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ। যেমন সামান্য একটি কথা "What's the matter?" ওথেলোর কণ্ঠে "কি ব্যাপার"; ডেসডিমোনার কণ্ঠে "কি হয়েছে", এমিলিয়ার কণ্ঠে "কি হল আবার", কথ্যভঙ্গির তারতম্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ এই নাটকের মূলধন।

(৬) ঘটনাসংঘাতে ও চারিত্রিক দ্বন্দ্বে যখন নাট্যচরিত্রের পরিবর্তন ঘটে তখন তার কথ্যভঙ্গিও বদলে যায়। তৃতীয় অঙ্কর শেষ থেকে ওথেলো ক্রমশ ইয়াগো হয়ে যায়, অর্থাৎ তার কথার মধ্যে থেকে সন্দিগ্ধ, কুটিল, অশালীন ইয়াগো ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। মানসপটের এই ক্রমপরিবর্তন একমাত্র কথ্যভঙ্গিতেই আনা যায়। যেমন চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে :

Othello : She says enough, yet she's a simple *bawd*
That cannot say as much; this is a subtle *whore*,
A closet, lock and key, of villainous secrets,
And yet she'll kneel and pray, I ha' seen her do't.

আধুনিক অনুবাদে :

বলল তো অনেক, তবে সে কুটনি নিতান্ত আনাড়ী
এটুকু যে বলতে পারে না ; এ তো একটা ঝুনো বেশ্যা
মুখেতে কুলুপ আঁটা শয়তানির আস্ত সিন্দুক,
পুজো আর্চা চলে তবু, আমার স্বচক্ষে দেখা।

গিরিশ ঘোষ পরিমার্জিত দেবেন্দ্র বসুর অনুবাদে :

"বাক্য সুপ্রচুর—আশ্চর্য কি!
অতি অল্পবুদ্ধি দূতী নিপুনা এ কাজে।
ছলনা প্রবীণা এতো চতুরা কুলটা।
গুপ্ত পাপ কথা
অন্তরে আবদ্ধ রাখে চাবি তালা দিয়ে।
তবু আচরণ করে ধার্মিকের মত—
দেখিয়াছি কতবার।

এতে ওথেলোর বক্তব্য আছে কিন্তু তার বিকৃত মনটা নেই। আবার নাট্যসংলাপ যখন ভাবাবেগের উচ্চগ্রামে ওঠে তখন চলিত কথ্যভঙ্গি তার বাধা হয় না। যেমন, ডেসডিমোনাকে হত্যার পর ওথেলোর শোকোচ্ছ্বাস :

Othello : My wife, my wife, my wife; I ha' no wife;
O insupportable! O heavy hour!
Meethinks it should be now a huge eclipse
Of sun and moon, and that the affrighted globe
Should yawn at alteration.

[V. Sc. II 97-103]

স্ত্রী আমার, স্ত্রী আমার, স্ত্রী, নেই, নেই,
উঃ উঃ অসহ্য! কী দারুণ দুঃসময়!
মনে হয় চন্দ্র সূর্য রাহুর বিপুল গ্রাসে
এই বুঝি লুপ্ত হবে, আর সেই কালান্তরে
ভয়ার্ত ধরণী এই দীর্ণ হয়ে যাবে।

(৭) কথ্যরীতি প্রয়োগে অন্যতম প্রধান বাধা কথিত বাংলায় সর্বনামের সম্পর্কের সঙ্গে মূলের বিভিন্ন চরিত্রকে বিন্যস্ত করা। প্রাচীন কাব্যরীতির

সর্বনামিক সাম্যে এই দুর্ভাবনা ছিল না। প্রাচীন রীতিতে 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস' অনুবাদের স্বপক্ষে অন্যতম যুক্তি এই ছিল : এই

> "ভাষা ব্যবহারের বড় সুবিধা তা ইংরেজী সর্বনামিক সাম্যকে মেনে চলে। দৈনন্দিন ব্যবহারে দূরের 'আপনি' কখন ও কোন মুহূর্ত থেকে কাছের 'তুমি' ও 'তুই'তে রূপবদল করে, সজাগ মনও তা খেয়াল রাখতে পারে না। এই যখন অবস্থা, ইংরেজী নায়ক নায়িকার প্রেমের গতির সঙ্গে তাল রেখে 'আপনি'কে 'তুমি' পর্যায়ে উত্তরণ করানো কম দায়িত্বপূর্ণ নয়।"
>
> [ibid]

এটা দায়িত্ব এড়ানোর অছিলা মাত্র।

মূল নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটা ছক করে নেওয়া তত বেশি দুরূহ নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সম্বন্ধ নির্ণয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা থেকে যায়। যেমন, ডেসডিমোনা, কেসিও ও ইয়াগোকে 'তুমি' বলবে না, 'আপনি' বলবে : গ্রাশিয়ানো (ডেসডিমোনার পিতৃব্য) ও লোডোভিকোর (ব্রাবানশিওর আত্মীয়) পক্ষে ওথেলোকে তুমি বলা সমীচীন হবে ? এইসব সমস্যা নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্বজাত নয়।

চলিত বাকধর্মে আবেগ উচ্ছ্বাসের মুখে সর্বনামের নিয়মিত সম্পর্ক ঠিক থাকে না। মূল নাটকে এই আবেগের সঙ্গে ভাষাগত কোনো সাঙ্কেতিক যুক্ত না থাকায়, অনুবাদ করার সময় এখানেই সমস্যা আসে।

ঘৃণা বা আক্রোশে

'ওথেলো'র প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে :

রোডা : মহামান্য সিনিয়র। গলা শুনে চিনতে পাচ্ছেন ?
ব্রাবা : না তো। কে তুমি ?
রো : আমি রোডারিগো।
ব্রা : তাহলে তো আরো অবাঞ্ছিত,
বারণ করেছি তোকে এ বাড়ির ধারে না আসতে ;
সোজাসুজি স্পষ্ট কথা আগেই আমার শুনেছিস,
পাবি নাকো আমার মেয়েকে।

রোডারিগোর সংবাদ সত্য প্রমাণিত হতে, আবার স্বাভাবিক 'তুমি' ফিরে আসে।

ব্রা : অভিশপ্ত এ জীবনে কী নিয়ে থাকব আর,
শুধুই তিক্ততা, কিছু আর নেই। রোডারিগো,
কোথায় দেখেছ তাকে ?

সবচেয়ে মুশকিল হয় ওথেলো নাটকে তৃতীয় অঙ্কের পর ওথেলো ও ডেসডিমোনার জগতে যখন প্রলয় আসন্ন। ওথেলো দ্বিধাবিভক্ত, সন্দেহ ও প্রেমের মন্থনে তার সমস্ত অস্তিত্ব বিষজর্জর। এই দুই ব্যক্তিত্বের মন্থনে নিমেষে নিমেষে সম্পর্কের যে ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকে, অনুবাদে তার আভাস আনতে হলে সর্বনামের হেরফের হবেই। ওথেলো 'তুমি' স্থিতি থেকে আদর ও অনাদরের তীব্রতার সঙ্গে তাল রেখে 'তুই'-এর দুই বিপরীত মেরুতে আন্দোলিত হতে থাকে।

আদরে—তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য : লা ৯০-৯৩

মায়াবিনী, যদি তোকে দূরে ঠেলি কভু
রসাতলে যাই যেন, ভালোবাসব না যেদিন তোকে,
প্রলয় আসবে ঘিরে।

অনাদর থেকে আদরে—চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য : লা : ৩৯-৪২

ডেসডি : ঈশ্বর জানেন, সত্যি বলছি।
ওথে : ঈশ্বর সত্যিই জানে, ভ্রষ্টা তুই নরকের কীট।
ডেস : কী বলছ ? কার কাছে ; কার সঙ্গে ; ভ্রষ্টা আমি কিসে ?
ওথে : উঃ উঃ ডেসডিমোনা, যাও, যাও, চলে যাও।

নিমেষে ভাবান্তর—ঐ : লা : ৬৬-৭০

ডেস : আশা করি, আমি সতী, এটুকু বিশ্বাস কর।
ওথে : হ্যাঁ, যেমন গ্রীষ্মের মাছি কসাইখানায়
ডিমপাড়া হতে না হতে জোড় খুঁজতে ছোটে ;
ওরে বিষলতা তুই কেন এত মধুর সুন্দর ?
এত মধু এ সুরভি, সারা অঙ্গ তোকে চেয়ে কাঁদে।

ভাবাবেগের কথা বাদ দিলেও, লৌকিক সম্পর্কেও কাছের লোক যে দূরে সরে যেতে পারে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে সর্বনাম প্রসঙ্গ শেষ করছি।

'ওথেলো' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে সন্দিগ্ধ ওথেলোর উপস্থিতিতে ডেসডিমোনা লোডোভিকোকে অন্তরঙ্গভাবে 'good cousin', 'cousin' বলে সম্বোধন করে। এ সম্বোধন স্বাভাবিক। লোডোভিকো তার আত্মীয়। বিদেশে পিত্রালয়ের লোককে পেয়ে আনন্দে স্বতই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এবং রাজকীয় ভব্যতার দূরত্ব এ ক্ষেত্রে রক্ষা করে না। কিন্তু ঘটনাটা ওথেলোর সন্দিগ্ধ মনে, বিশেষত ইয়াগো একটু আগে যখন তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে ভেনিসের মেয়েরা 'let God see the pranks they dare not show their husbands' অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এইজন্যে লোডোভিকো বিতাড়িত ডেসডিমোনাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে যখন অনুরোধ করে, তখন ওথেলো তাকে ফিরিয়ে এনে পরস্পরের সম্পর্কের প্রতি যে কুৎসিত কটাক্ষ করে তাতে লোডোভিকো ও ডেসডিমোনা উভয়েই স্তম্ভিত হয়ে যায়। অনুবাদে এই অংশ:

ওথে : একে নিয়ে কী করতে চান?

লোডো : কে, আমি? কি বলছেন?

ওথে : আপনিই তো চাইলেন ওকে আমি আবার ফেরাই;
জানেন ও ফিরতে পারে, ফিরে ফিরে ঘোরে তবু চলে।
আবার, আবার ফেরে, কাঁদতেও পারে, হ্যাঁ, কাঁদে;
এবং বিনীত নম্র, যা বললেন, নম্র বিনীত,
খুবই বিনীত।

এই উক্তির পশ্চাতে ইয়াগোর 'I know my country's disposition well' কাজ করছে, এবং ডেসডিমোনার সব দুঃখ নিছক ছলনা হয়ে যাচ্ছে। ডেসডিমোনার বুঝতে কষ্ট হয় না, লোডোভিকোর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া আর নেই। তাই এই অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লোডোভিকো যখন ওথেলো ও ডেসডিমোনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখন ডেসডিমোনা ও লোডোভিকো উভয়েই লৌকিক সৌজন্যের দূরত্ব সচেতনভাবে রক্ষা করছে। এখানে মূলের অংশটুকু উদ্ধৃত করছি:

Lod. : Madame, good night. I humbly thank your ladyship.

Desdimona : Your Honour is most welcome.

সেই 'good cousin'-এর নৈকট্য একেবারে নেই। স্বভাবত 'তুমি'র জায়গায় এসেছে 'আপনি'র দূরত্ব।

কথার কায়কল্পে যখন মূল নাট্য চরিত্রের এই দেশীয় প্রতিরূপে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, তখন অনুবাদে জীবন-সম্পৃক্ত লৌকিক ভাষার অবাধ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে, এ কথা বলা দরকার, অনুবাদ প্রয়াসেরও উপযুক্ত ক্ষেত্র দরকার। বাংলা ভাষায় বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গিতে শেক্সপীয়রের ও তাঁর নাটকের নিয়মিত আলোচনা এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। ইদানীংকাল পর্যন্ত বাঙালী পণ্ডিতদের শেক্সপীয়রীয় মনীষিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজীতে সীমাবদ্ধ। তার ফলে, তাতে আমরা যতখানি বিদেশী শেক্সপীয়রীয় পণ্ডিতদের প্রতিধ্বনি পাই, ততখানি বাঙালীর মন ও চোখ দিয়ে দেখা শেক্সপীয়রকে পাই না। প্রত্যেক দেশের মানস গঠনে এমন একটি অনন্যতা আছে, যা তার দর্শন ও মননকে প্রভাবিত করে: ওই অনন্য দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ শিল্পসাহিত্যের অদৃষ্টপূর্ব কোন দিক প্রকট করে। জার্মানীতে গ্যএটে, লেসিং, শ্লেগেল প্রমুখ মনীষীরা শেক্সপীয়রকে যদি জার্মান চোখে বিচার না করতেন, তাহলে শেক্সপীয়রীয় সমালোচনার শুধু যে সমূহ ক্ষতি হত, তাই নয়, জার্মান ভাষায় শ্লেগেল ও টিক-এর অনবদ্য অনুবাদ হয়ত সম্ভব হত না। তেমনি রুশ বা ফরাসী মনোগঠনে যদি জার্মান Sturm und Drang আন্দোলনের আতিশয্য না থাকে, যদি শেক্সপীয়রকে ভলতেয়ার বা তলস্তয়ের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তা ওই দেশীয় প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধনের বিশিষ্ট পদ্ধতি বলেই স্বীকার্য। যোগ যে সাধিত হয়েছে, তার প্রমাণ রুশ দেশে পুশ্‌কিন্ থেকে একালের মারশাক্, পাস্তেরনাক, এবং ফরাসী দেশে য়ুগো থেকে একালের আঁদ্রে জিদ্।

অনুবাদ, যে-কোনো সার্থক শিল্পকর্মের মতো নিয়ত ধ্যান ও নিবিষ্টতার অপেক্ষা রাখে। মূলের সঙ্গে যোগ থাকলেও তার নিজস্ব স্বতন্ত্র শিল্পসত্তা আছে। এ যেন 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়'। এবং যেহেতু ধ্যানের মাধ্যমে একাত্মতার কালসীমা অনির্দিষ্ট, তাই মূল নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বর্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক। ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির সঙ্গে মুখের ভাষাও বদলাবে। এ ছাড়া ভাষামাত্রই নিজস্ব জীবনীশক্তির বিকাশে নিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং আজকের ভাষার দৈন্য দশ বছর পরে নাও থাকতে পারে।

এইসব দিক থেকে বিচার করলে, বোধ হয় প্রতি দশ পনেরো বৎসর অন্তর নতুন করে অনুবাদ করা দরকার। অনুবাদ সেইদিন স্বতন্ত্র শিল্পকীর্তি বলে গ্রাহ্য, যেদিন মূলের ঋণ স্বীকার করেও মূল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন ও আত্মনির্ভর সত্তায় তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। *

অনুবাদ 'ওথেলো' থেকে, কিছু অংশ :

ওথেলো—দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য। ইয়াগোর গান :

[King Stephen was a worthy peer]

ষ্টিফান রাজা কী নামজাদা
পায়জামাতে ছ-আনা দাম লাগে ;
রাজা ভাবেন ছ-আনা দাম জায়দা,
ডাকাত বলে তাড়েন দর্জিটাকে ;
কেউকেটা লোক জানে সবাই তাঁকে,
আর তুমি তো হাড়হাবাতে চাষা।
দেশের পতন হয় দেমাকি ঝাঁকে,
ছেঁড়া কামিজ পর, ছেঁড়াই খাসা।

ওথেলো—পঞ্চম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য

[Othello : Behold I have a weapon থেকে]

ওথেলো। দেখুন, আমার আরো এক অস্ত্র আছে,
এর চেয়ে ভালো কিছু সৈনিকের কটিবন্ধে কভু
পায়নি আশ্রয় ; এ জীবনে এমন গিয়েছে দিন,
যখন এ তুচ্ছ বাহু ওই তরবারিটুকু নিয়ে
আপনার এ বাধার বিশগুণ বাধা ভেদ করে
অক্লেশে করেছে পথ : থাক্, সব মিথ্যা গর্ব
নিয়তিকে কে বাঁধতে পারে ? সেদিন নেইক আর।
ভয় নেই, ভয় নেই, যদিও সশস্ত্র আমি :
এ আমার যাত্রা শেষ, এখানেই সমাপ্তি আমার,

* এই প্রবন্ধের সারাংশ গত ২০এ এপ্রিল ব্রিটিশ কাউন্সিলএ অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

এ জীবন তরণীর এইখানে দিকপ্রান্তসীমা।
ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন ? মিথ্যা ভয়, অমূলক ;
শুষ্ক তৃণদণ্ড দিয়ে ওথেলোকে করুন আঘাত
তাতেই সে পড়ে যাবে। কিন্তু ওথেলো কোথায় যাবে ?
এখন তোমাকে দেখি দেখাচ্ছে কেমন ? হা অভাগী,
সাদা যেন অঙ্গবাস ; পরলোকে দেখা হলে পরে
তোমার ও দৃষ্টিশেল স্বর্গ থেকে আমার আত্মাকে
হানবে অতলে, পিশাচে তা ছিঁড়ে নেবে। হিম, হিম,
হিমেল তুষার, ঠিক সতীত্ব তোমার ; ওঃ হতভাগা !
পিশাচেরা, আমাকে চাবুক মারো ;
কাড়ো, কাড়ো, এই স্বর্গ দর্শনের অধিকার,
ঝঞ্ঝায় তাড়িত কর, দগ্ধ কর গন্ধক খনিতে,
আমাকে ধুইয়ে দাও আগুনের তরল প্রপাতে।
ওঃ ওঃ ডেসডিমোনা ! ডেসডিমোনা ! নেই, নেই !
ওঃ ওঃ ওঃ।

বিষ্ণু দে

শেক্সপীঅর ও বাংলা

ভাবতে ভালো লাগে যে শেক্সপীঅরের চতুর্থশতবার্ষিকী হুজুগের অনেক আগে থেকে এবং সরকারী প্রচেষ্টার বহু আগেই বাংলায় শেক্সপীঅরের অনুবাদ করেছেন একাধিক গণ্যমান্য লেখক। অন্তত বিশপঁচিশটি নাট্যানুবাদ বাংলায় পড়তে পাওয়া যায় এবং কমবেশি ক্ষমতা হলেও মোটামুটি স্বচ্ছন্দে পড়া যায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি দুর্গত প্রদেশের ভাষার পক্ষে গর্বের কথা।

বিদ্যাসাগরের অবলম্বন রচনা 'ভ্রান্তিবিলাস' নিশ্চয়, মাইকেলের হেকটরবধ-এর মতোই বাংলাদেশের সাহিত্যচৈতন্যে স্মরণীয় প্রসার। মর্চেণ্ট অব্ ভেনিসের বাংলায় আদি অনুবাদের বয়সও আমাদের সুনীলবাবুর কাছেই শুনেছি একশো বছরের বেশি। ম্যাকবেথের অনুবাদ শুধু যে মহানাট্যকার ও নট গিরিশচন্দ্রের ভাবালম্বনে বঙ্গীয় প্রাণ পেয়েছিল তাই নয়, সম্ভবত রাজনৈতিক সামাজিক প্রেরণার অগোচর আবেগেই আমাদের কৃতী লেখক অনেকেই ম্যাকবেথ ভাষান্তরিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুবাদ অসতর্ক হলেও পঠনীয়, বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পদ্যানুবাদের লঘু পঠনীয়তা উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার স্বদেশী মানুষ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ছন্দোময় গদ্যে অনুবাদটিও পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নীরেন রায় মহাশয়ের আক্ষরিক প্রচেষ্টাও অনেক পাঠকের পরিচিত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচিত্র রচনায় রোমিও এণ্ড জুলিয়েট্, জ্যোতি ঠাকুরের জুলিয়াস সীজার, এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের, দেবেন্দ্রনাথ বসুর,

প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "ওথেলো"—অনুবাদপ্রকাশের উপলক্ষে লেখা।

পশুপতি ভট্টাচার্যের অ্যাণ্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা, ওথেলো, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, সিম্বেলীন প্রভৃতি হয়তো আজ অনেকের মনে নেই। তবু উৎপল দত্তের নাট্যপ্রচেষ্টা দেখে, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ তিনটি পড়ে আমি অন্তত আশান্বিত।

শেক্সপীঅরের বাংলা অনুবাদ পড়ে যা সচরাচর মনে হয়, তা উপন্যাসের জগতে যিনি বালজাকের সঙ্গে মিলে শেক্সপীঅরের জুড়ি, সেই তলস্তয়ের শেক্সপীঅর-বিচারকে একটি বিষয়ে সহজেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। তলস্তয়ী না হলেও সংবুদ্ধিকে মানতেই হবে যে তলস্তয় তাঁর বিচারে যে সব মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন সে সাহিত্যিক, নৈতিক, সাহিত্যিক সমালোচনা এক কথায় হেসে ওড়ানো সহজ হলেও কথাগুলি গভীর ও জটিল। তার মধ্যে একটি প্রধান বক্তব্য ছিল তলস্তয়ের মতে শেক্সপীঅরী নাট্যকাব্যের বাক্‌সর্বস্বতার বিষয়ে।

নাট্যের প্রয়োজন বা চরিত্রের প্রয়োজনে নয়, কথা থেকে কথার ঝোঁকে শেক্সপীঅরের প্রতিভা নাকি স্ফুরিত হয়ে চলে। তলস্তয় ছিলেন মহান গদ্যলেখক, গল্পের উপন্যাসের এবং নাটকেরও; আর কে না জানে শেক্সপীঅর ছিলেন মুখ্যত কবি, কবিনাট্যকার রাজ্যের বাদশা। সেইজন্যই কি এলিঅটের মতো কবি নাটক লিখতে বসে উত্তরোত্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন কবিত্বহীনতার নাট্যরচনার? যার জন্য তাঁর শেষ কটি নাটক আধুনিক মঞ্চে নাকি খুব জমে, পাঠে তা যতই কাব্যহীন লাগুক। কিন্তু শেক্সপীঅরের নাটকে প্রতিটি চরিত্রের যে বিশিষ্ট ইমেজপরম্পরায় বা কল্প-প্রতিমার পরম্পরায় সংহত নাট্যচারিত্র্য, সে কি ঐ কথার কবিত্বের নবাবী ছাড়া কখনও প্রাণ পেত?

সে যাই হোক, বাংলা অনুবাদ বিষয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে কথা বা শব্দের এই মাহাত্ম্যে আমাদের বিদ্বজ্জন ভোলেন নি। সে কি শুধু গল্পের জন্য, ঘটনার নাট্যাঘাতের জন্য, লোভভয়ক্রোধ ইত্যাদি মানুষের রিপুগুলির বাহন তৈরির জন্য, যা কাব্যের পথে উপস্থিত হলেও স্বভাববশে কাব্যের তোয়াক্কা রাখে না? তা না হলে এত মহাজন কেন কাব্যনাট্যের নাটকীয়তার দিকে ঝোঁক দিয়ে এই কাব্যের দৈবগুণ তো বটেই এমন কি অনুবাদের যথাযথতাও গৌণ মনে করেন? অন্যপক্ষে নীরেন্দ্রনাথের মতো রসজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাকবেথের এমন অনুবাদ করেন, যা শেক্সপীঅর

পরিষদের কেতাবী চর্চার উপযুক্ত হলেও, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ভাষায়, উচ্চারণ করা যায় না।

সুনীল চট্টোপাধ্যায় এই দিক থেকে বিস্ময়কর অনুবাদ দেখান তাঁর "মর্চেন্ট অব ভেনিস"-এ। "অ্যাজ ইউ লাইক ইট"-এর তৎকৃত অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। সুনীলবাবুর অনুবাদতত্ত্ব মূলানুগতায় নির্ভর। এবং তার প্রায় বিপরীত কঠিন দ্বিতীয় দাবিটি সজ্ঞানে মানতে গিয়ে তিনি যে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে পাঠকের কৃতজ্ঞতা জানাই : তাঁর অনুবাদ পড়া যায়। এবং অভিনয়ও করা যায়।

অনুবাদকার্যের দুরূহতা হয়তো নিজে কাব্যসংবেদ্য মানুষ হয়ে অনুবাদ করতে গেলে সম্যক বোঝা সহজ। কিন্তু সুকুমারমনা পাঠক একটু কল্পনা করলেই বুঝতে পারবেন কতগুলি স্তরে অনুবাদককে এই দুরূহতার মুখোমুখি বসে কাজ করতে হয়। প্রথমত এলিজাবিথীয় সমাজসভ্যতার শিকড় বাংলায় গজায় নি। কোথায় সেই ডাকাতির, সাম্রাজ্যবাদের বীজ-রোপনের, বুর্জোয়া ব্যবসায়ের, লুটতরাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা? কোথায় সেই পরমপাপবিদ্ধ খৃষ্টধর্মের আত্মগ্লানি, আবার নব মানবিকতার মুক্তিজিজ্ঞাসার উদ্দাম উল্লাস? আর দ্বিধাভক্ত দৈহিকতার নেশা? আবার সমবেদনার গভীরতা ও মনের সৌকুমার্য, এবং স্থূলতা আর অস্থির কিন্তু বলিষ্ঠ অশ্লীলতা? মানুষের আবেগ সর্বত্র মূলত এক হলেও তার পুরুষার্থ ও রসাভাসের বিন্যাস তো দেশকালের ও সমাজের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। ফলে ভাষার সমতা খুঁজে পাওয়া যায় না ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, এমন কি একই ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে। অধিকন্তু, নাটক যেহেতু শুধু পঠনপাঠনের জন্য লেখা কাব্য নয়, পরন্তু অতিমাত্রায় জীবনময় কর্মনির্ভর, তাই নাটকের ক্ষেত্রে ভাষান্তরের সমস্যা আরো জটিল।

এ কথা মনে রাখলে বোঝা কঠিন নয়, কী সাহস ও দীর্ঘ ধৈর্য আছে সুনীলবাবুর শেক্সপীঅরী নাটকগুলির অনুবাদের কৃতিত্বে। তর্ক অবশ্য উঠতে পারে 'ওথেলো'র এই অনুবাদের তত্ত্ব বিষয়ে। সাহিত্যপত্র-তে প্রকাশিত অনুবাদে সুনীলবাবু যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন, অসীম অধ্যবসায়ে তা আবার পরিবর্তন করে তিনি এবারে 'ওথেলো'র অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছেন। প্রথম আনুবাদিক ভাষ্যে তাঁর মন ছিল মহাকবির কাব্যভাষার মাহাত্ম্যে। কিন্তু আজকের বাঙালী রঙ্গমঞ্চে সাধুভাষার কবিত্ব নাকি অচল, শ্রোতারাও

নাকি বিব্রত বোধ করেন। তাই সুনীলবাবু এবারে বর্তমান নাট্যাবৃত্তির রুচিকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সন্দেহ নেই, যে সাহিত্যিক ভাষায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা নাটকীয় কাব্য লিখতেন এবং যে নাটকে বাঙালী শ্রোতার দক্ষ শ্রবণশক্তি ও সবল কবিত্ববোধ তৃপ্তিলাভ করত, তা অধুনাতন রুচির অভ্যাসে ব্যবহার করা কঠিন। অথচ বিশুদ্ধ অর্থাৎ সীমা-নির্দিষ্ট কথ্যভাষায় ভাবের এক মহল থেকে আরেক মহলে চট্ করে যাওয়াআসা সচরাচর সাবলীল হয় না, তাছাড়া আমাদের কথ্যভাষা ক্রিয়ার ব্যাপারে বড়ই দুর্বল। অস্বাভাবিক আড়ষ্ট কবিয়ানা থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার চেষ্টা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু এখন বোধহয় পরবর্তী দ্বিজ স্বাধীনতার চর্চা করাও দরকার।

বিশেষ করে শেক্সপীঅরের মতো চলাচলের কবির নাটকের অনুবাদে, কারণ মহাকবির নিজের ভাষা সাধুরীতি ও কথ্যরীতির উভয়ত জল-চল্ যুগের অনির্দিষ্ট ইংরেজির চরম কীর্তি। এবং কন্‌ভেনশনাল বা সংকেতিত মার্গেই তাঁর নাটকের জগতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে, যদিচ সে তীর্থক্ষেত্রে বিচরণের অবাধ স্বাধীনতা তাঁর দৈবী প্রতিভার নিজস্ব বাহাদুরি। কিন্তু এ-বিষয়ে সচেতন ও বিনীতভাবে সচেষ্ট থাকা ছাড়া আর কিছু এখনই আশা করা বোধহয় আতিশয্য। বস্তুত ইংরেজি কাব্য আমরা দেড়শো বছর ধরে পড়ছি, মুখস্থ করছি, নোটবই লিখছি বটে, কিন্তু আমাদের মনের অন্দরে তা এখনও আত্মীয় হয়ে ওঠে নি।

বাংলাদেশে শেক্সপীঅরচর্চার একটা বিহঙ্গচক্ষু হিসাবনিকাশ করলেও বোঝা যায় কী অবান্তর আমাদের ইংরেজিজানা সাহিত্যবিলাসীর অভিমান। হিন্দু কলেজের যুগে কর্তাদের সাহিত্যোৎসাহ ছিল প্রবল এবং বেকারবারী, শুদ্ধ, কিন্তু তাঁরাও শেক্সপীঅরকে দেখতেন বিচ্ছিন্ন এক একক প্রতিভার উদাহরণ হিসাবে। ঐ প্রতিভা, সবাই জানে, অসামান্য, তবু অসামান্য কবিপ্রতিভার জমিতেও থাকে অনেক উত্তরাধিকারের মাটি-জল-রৌদ্র এবং সমসাময়িকদের মানসিক প্রভাব, কাব্যচেষ্টার নির্দেশ। কিন্তু চার্লস ল্যাম্ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরিচিত হলেও এলিজাবিথীয় বা তাঁর পূর্বজ কাব্য বা নাট্যান্দোলন বিষয়ে শুনেছি তাঁরা খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ফলে শেক্সপীঅরের 'নেতিমূলক শক্তিমত্তা'র সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ডসন ডিরোজিওর শিষ্যরা ভাবতেন 'অহম-নির্ভর মাহাত্ম্যবাদী' মিলটনের সমধর্মিতার কথা,

ডন বা অন্যান্য মানবিক কবিদের নয়, যাঁদের জীবন্ত শব্দব্যবহারে, ছন্দে, উক্তি বা ব্যঙ্গবিদগ্ধ দ্ব্যর্থময় গভীরতার দোসর পায় শেক্সপীঅরের জীবনোৎসারিত সেমান্টিক ঐশ্বর্যে। পূর্বপুরুষ হিন্দু কলেজের ইংরেজি ও ইতিহাসের বৃত্তিধারী ছিলেন, সেইসূত্রে সেকালের শেক্সপীঅর-প্রীতির বিশেষত্ব বিষয়ে আলোচনা শুনেছি এবং দেখেছি পরের কয় যুগের সাহিত্যিক রুচির পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য। শেক্সপীঅর, মিলটন, বাইরন—অবশ্য ওআর্ডসওআর্থ বিষয়ে মাইকেলের আশ্চর্য চিঠি স্মরণীয়—ইত্যাদির বিন্যাসটি পালটে যায়। শেক্সপীঅর, মিলটন—হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে বাইরন হয়ে পড়েন অনাদৃত, আসেন লর্ড টেনিসন।

সাম্রাজ্যের দূর দরিদ্র প্রদেশের এংলোনেসান্সে হয়তো এই সব রকমফের স্বাভাবিক, বিশেষ করে মহারাণীর ভাষায় আশৈশব আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন দেখা যায় যে মানসের তলে তলে, রক্তস্রোতে ইংরেজি চলে না, বরং মননকেই করে দেয় এই শিক্ষার চোটে বিকল, নীরক্ত ; তাই নিকটকালীন আধুনিক বা নূতন কবির সাক্ষাতে এ দেশে শিক্ষিতসমাজে এত বিমূঢ়তা। সেইজন্যই বোধহয় শিক্ষণ-ব্যবস্থায় এত বছর ধরে শেক্সপীয়র নির্যাস পান করিয়েও দেশে আজ অবধি শেক্সপীঅরের কোনও মৌলিক অথবা সাহিত্যসংবেদিত সমালোচনা বেরোল না, বহু মূর্খপণ্ডিতী বা গতানুগতিক, পরের মুখে ঝালমিঠা খাওয়া চেষ্টা ছাড়া, তা সে ইংরেজিতেই হোক বা বাংলাতে। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। এবং স্বাভাবিক কারণেই। কারণ তিনি কবি, কারণ তিনি সাহিত্যমাত্রকেই ভোগ্য, নন্দনকর, জীবন্ত—এই বিচারণায় গ্রহণ করতেন, তাঁর পঠনপাঠন নিতান্তই শুদ্ধ অর্থাৎ ডক্টর-কম্পাউণ্ডর হবার মতো মনের মৃত্যুতে খাদ্য সংগ্রহ করার তত্ত্বের তিনি ছিলেন আজীবন বিরোধী। এবং ইংরেজিতে তাঁর কর্তৃত্ব জগতবিখ্যাত হলেও তাঁর মন মানুষ হয়েছিল মাতৃভাষার অস্থিমজ্জাগত ঘনিষ্ঠ মাধ্যমে। তাই সম্ভব ছিল তাঁর তর্কসাপেক্ষ কিন্তু মৌলিক শেক্সপীঅর-বিচার, যা 'প্রাচীন সাহিত্য'-তে প্রতিবাদী আতিশয্যে হয়তো ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন হলেও 'ক্রিয়েটিভ্ ইউনিটি'-র পরিণত বক্তব্যে পরিষ্কার। কিন্তু সাহিত্যানীহ হলেও পণ্ডিতী পরিশ্রমে কিছু হল না কেন? অথচ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের মতো অসাধারণ প্রাণময় শেক্সপীঅর-শিক্ষক তো এদেশে বহুকাল ধরে পড়িয়েছেন।

তাই উৎপল দত্তদের নাট্য আন্দোলনে শেক্সপীয়রের বিশিষ্ট মর্যাদা

আশান্বিত লাগে। এবং ইচ্ছা করে বিজন ভট্টাচার্যকে দেখি বাংলার নাট্যরূপে লিয়রের ভূমিকায়। শম্ভু মিত্র কবে মাতবেন হ্যামলেটের উদ্‌ভ্রান্ত স্বগতোচ্ছ্বাসে বা টাইমনের চরম তিক্ততায় অথবা কোরিওলেনসের আত্মহা গর্বের নাটকীয়তে? রূপকার-সম্প্রদায় এবারে ব্যাপিকাবিদায়ের ভ্রান্তিবিলাসী হাস্য থেকে চলে আসুন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার মধ্যে বেনেডিক্ট ও বিয়েট্রিসের বাকযুদ্ধে।

এবং এই আশায় ইন্ধন জোগায় সুনীলবাবুর নিরন্তর শেক্সপীয়র—শ্রবণ না হোক—মনন ও ধ্যান এবং তাঁর নিরলস পরিশ্রম। তাঁর এই তৃতীয় প্রয়াস তাই আমার কাছে এত মূল্যবান—যদিচ স্বর্গত বন্ধুবর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তর্কে কখনও একমত হতে পারি নি, যে 'ওথেলো'ই মহাকবির শ্রেষ্ঠ নাটক ; যেহেতু প্রেম নয়, ঈর্ষাই হচ্ছে মানুষের প্রেমের আদি প্রেরণাশক্তি। আশা করি, অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার ঈর্ষাজয়ী মরণোত্তীর্ণ প্রেমের রাজকীয় আকাশ-বিহার সুনীলবাবুকে অনুপ্রাণিত করবে তাঁর চতুর্থ অনুবাদে॥

শেক্সপীয়রের রচনা থেকে

ম্যাকবেথ

প্রথম অঙ্ক। সপ্তম দৃশ্য

[ম্যাকবেথের প্রসাদের একটি ছোট কক্ষ। ম্যাকবেথের প্রবেশ]

ম্যাকবেথ : যদি এ কাজের সঙ্গে শেষ হয় কাজ,—তবে ভাল।
যত শীঘ্র পাট চোকে, তত ভাল। একটি সংহার
যদি জালে তুলে নিতে পারে সব সংহারের ফল
যথার্থ গুটিয়ে নেয় সব জের, সব ফলশ্রুতি
একটি হত্যায় যদি হয়ে যায় এই পৃথিবীতে
সমস্ত হত্যার সুরু আর শেষ—তা হলে এখানে,—
এখানে, কালের এই জলমগ্ন শীর্ণ বেলা থেকে
ঝাঁপ দিতে পারি পরকালে। অথচ এ সব ক্ষেত্রে
এখানেই হয়ে যায় সমস্ত বিচার। আমরা ত
শোণিত-সাধন শিক্ষা দিয়ে থাকি। শেখানোর পর
গুরুকেই হতে হয় শিক্ষার শিকার। বিষপাত্র—
আমরা যা ভরে তুলি—সমদর্শী ন্যায়ের নির্দেশে
সেই পাত্রে মুখ দিতে হয়। এখানে আছেন তিনি
দ্বিবিধ বিশ্বাসে। প্রথমত; আমি জ্ঞাতি, তাঁর প্রজা
ও কাজ না করার পক্ষে এ দুটি-ই যথেষ্ট কারণ;
আবার অতিথি তিনি। ঘাতকের মুখের উপরে
দোর বন্ধ করে তাঁকে রক্ষা করা আমার উচিত
অসঙ্গত নিজে ছুরি ধরা। ফের, এই ডানকান
রাজশক্তি প্রয়োগে এমন নম্র ও বিনয়ী আর
রাজধর্মে এত নিষ্কলুষ;—যে তাঁর সদ্‌গুণরাজি
তূরী-মুখী দেবদূতের মতন উচ্চকিত হবে
তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্যতম পাপের নিন্দায়।

এবং করুণা দাঁড়িয়ে ঝঞ্ঝার চূড়া দেখা দেবে
নগ্ন নবজাতকের মত; অদৃশ্য হাওয়ার ঘোড়া
ছুটিয়ে আসবে ত্রিদিবের পক্ষবাণ দেবশিশু
প্রত্যেক লোকের চোখে ফুঁড়ে দেবে সে জঘন্য কাজ
ডুবে যাবে অশ্রুতে বাতাস। মাতাতে দুরন্ত ইচ্ছা
কাঁটা মারা জুতো পায়ে নেই, আছে সেই শুধু এক
উত্তাল উচ্চাশা, অন্ধ; লাফিয়ে সে শূন্যে বহুদূরে
অন্য দিকে টলে পড়ে যায়।

[লেডী ম্যাকবেথ এসে।]

কি ব্যাপার? কি খবর?

লেডী ম্যাকবেথ : ওঁর খাওয়া প্রায় শেষ। ঘর ছেড়ে চলে এলে কেন?

ম্যাকবেথ : কেন, তলব হয়েছে নাকি?

লেডী ম্যাকবেথ : তুমি কি জানো না?

ম্যাকবেথ : এ কাজে আমরা আর এক পাও এগিয়ে যাবো না
সম্প্রতি আমাকে তিনি দিয়েছেন নূতন সম্মান
রাজ্যের সমস্ত লোক আমার সুখ্যাতি করে কত
সেই নূতন দীপ্তিতে মজে থাকা এখন উচিত
এত তাড়াতাড়ি তাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়ো না।

লেডী ম্যাকবেথ : যে আশায় সেজে গুজে ছিলে এতদিন সে কি ছিল
কোন পাঁড়-মাতালের ঘোর? সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে?
ঘুম থেকে জেগে উঠে করুণ বিবর্ণ মুখে দেখো
বিগত কামনা—যা সহজে স্বীকার করেছ তুমি।
তোমার প্রেমের রীতি কী রকম এখন বুঝেছি!
কাজে ও সাহসে ঠিক আকাঙ্ক্ষার মত দৃঢ় হতে
এত ভয় পাও? এই ভাবে তাকে পাবে যাকে তুমি
মনে কর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, অথচ
নিজের মনের কাছে হয়ে রবে ভীরু কাপুরুষ?
বলবে কি 'সাহস হয় না কিন্তু বড় ইচ্ছা করে'
প্রবাদ কথার সেই দ্বিধান্বিত বেড়ালের মত?

ম্যাকবেথ : দোহাই তোমার চুপ করো।
মানুষের সাধ্যে যতটুকু, ততটুকু করতে পারি
তার বেশি যে করে সে মানুষ নয় ক', অন্য কিছু।

লেডী ম্যাকবেথ : কথাটাকে পেড়েছিলে যখন আমার কাছে এসে
তখন কি পশু হয়েছিলে ? যখন বলেছ তুমি
সেই কথা,—তখন, তখনই ছিলে প্রকৃত পুরুষ।
এবং স্বপ্নকে যদি বাস্তবের রূপ দিতে পার
তবে হবে মানুষের চেয়ে আরও ঢের ঢের বড়।
সে কাজের উপযুক্ত স্থান কাল তখন ছিল না
তবু তুমি গড়ে তুলতে চেয়েছিলে সুযোগ সুবিধা
নিজ হতে সে সুযোগ আজকে এসেছে ; সেই ক্ষণ
এল,—আর তুমি হারালে সাহস। আমি ত শিশুকে
দিয়েছি বুকের দুধ, আমি জানি কী কোমল
দুধের শিশুকে ভালবাসা। তবু যদি পণ করি
আমি পারি,—যখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে
পারি, তার তুলতুলে মাড়ি থেকে সরিয়ে মাই-এর বোটা
সজোরে আছাড় মেড়ে সব ঘিলু বার করে দিতে।
—অথচ এমন পণ তুমি করেছিলে।

ম্যাকবেথ : যদি ব্যর্থ হই ?

লেডী ম্যাকবেথ : ব্যর্থ হব ?
সুরে সুরে টান করে বেঁধে রাখ সাহসের তার
বিফল হব না তবে। ডানকান ঘুমাবে যখন,
সমস্ত দিনের তীব্র পথশ্রমে নিশ্চয়ই আজ
অঘোরে ঘুমাবে, তার দুই প্রতিহারীদের আমি
খাইয়ে অঢেল মদ এমন বেহুঁস করে দেবো
যাতে স্মৃতি, মেধার প্রহরী, হবে আচ্ছন্ন, আতুর
বাষ্পময় হয়ে যাবে জ্ঞান বুদ্ধি বিচার ক্ষমতা।
শূয়োরের মত তারা ঘুমিয়ে পড়লে, মদে মত্ত
তাদের চেতনা হলে অচেতন মড়ার মতন
তুমি আমি দুই জনে কি না করতে পারি অরক্ষিত

ডানকানের ওপর ? মত্তপ ওদের ঘাড়ে তবে
চাপাতে পারবোই সব অপরাধ। তারা বয়ে যাবে
মহৎ হত্যার সব দায়ভার—

ম্যাকবেথ : গর্ভে ধর ছেলে, শুধু ছেলে
তোমার নির্ভীক সত্তা থেকে শুধু সৃজন সম্ভব
কুমার কলাপ। প্রতিহারীদের যদি রক্তে রক্তে
মাথামাখি করে দেই, যারা তার ঘরেই ঘুমন্ত,
ব্যবহার করি যদি ওদের হাতের দুটো ছোরা
তা হলে ওদের লোকে ভাববে না কি হত্যাকারী বলে
বলবে না কি এ ওদেরই কাজ ?

লেডী ম্যাকবেথ : কার সাধ্য অন্য কিছু ভাবে ? তার মৃত্যুতে এমন
তুলবো শোকের বান, কেঁদে কেটে চিৎকারে চিৎকারে
এমন মাতাবো পাড়া, কার সাধ্য অন্য কিছু ভাবে ?

ম্যাকবেথ : তাই হবে। কেটে গেল দ্বিধা, দেহ জ্যা-বদ্ধ ধনুক
তৈরি হও প্রতি অঙ্গ ভয়ঙ্কর কাজের শপথে
শোভন ছলায় চল ব্যঙ্গ করে কাটাই সময়
কপট মুখের নিচে ঢেকে রাখ যা জানে হৃদয়।

[ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথ চলে গেল।]

রাম বসু

হ্যামলেট, ডেনমার্কের রাজপুত্র

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রথম অঙ্ক

[অংশ]

রাজা : এ কেমন, এখন-যে মেঘরাশি ঘিরে আছে মুখ ?

হ্যামলেট : না, তেমন নয় প্রভু, বড় বেশি রৌদ্রে আছি কিনা !

রানী : বৎস হ্যামলেট, করো উন্মোচন তোমার ও-রাত্রিবর্ণ বাস
এবং তোমার চক্ষু দেখুক বন্ধুর দৃষ্টে ডেনমার্কের মাটি

খুঁজো না মৃত্তিকাশায়ী ভট্টারক পিতাকে তোমার
নতনেত্র, নয়নের আনত পাতায় চিরকাল।
স্বাভাবিক বলে মানো : জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু
প্রকৃতির বর্ত্ম বেয়ে অসীম প্রস্থানে।
হ্যামলেট : তাই, দেবী, এ-ই স্বাভাবিক।
রানী : যদি বা ভাবিস তাই এতটা গুরুত্ব কেন দিতে চাস তুই—
হ্যামলেট : দিতে চাই দেবী ! না তো এই যথাযথ, দিতে চাওয়া
অজ্ঞাত আমার।
এ কেবল মসীবর্ণ কৃষ্ণ আবরণ নয়, জননী আমার,
এ নয় চলিত প্রথাসিদ্ধ কৃষ্ণ পরিধান স্বভাব গম্ভীর,
চেষ্টাকৃত শ্বাসে নয় দেখাবার জন্য দীর্ঘশ্বাস,
না চক্ষের ফলপ্রসূ বহতা নদীও নয়
না, মুখের সবিষাদ অভিনয় নয়
সব রূপে, মেজাজে, শোকের আচরণে
আমাকে যথার্থ সত্যে প্রতিভাত করে : অবশ্যই মনে হতে পারে
যে কোন ব্যক্তিরই পক্ষে অনুরূপ অভিনেয়, তাই :
তবু যা নিহিত রয়, সে রয়েছে অলক্ষ্যে দুঃখের,
এগুলি কেবলমাত্র প্রদর্শনী বস্ত্র, মাত্র শোকের পোশাক।
রাজা : চমৎকার, হ্যামলেট, তোমারই চরিত্রসাধ্য প্রশংসার কাজ,
গতায়ু পিতার জন্য শোককৃত্য কর্তব্য এ সব,
তবু মনে রেখো স্থির, তোমার পিতাও পিতৃহীন হয়েছেন,
সে পিতা হারিয়েছেন তাঁরও পিতা ; এবং যে বেঁচে থাকে
অপত্যের পালনীয় কর্তব্যও বাঁচে তার আরও কিছু দিন
সলাভ দুঃখের কর্ম : কিন্তু ধৈর্য ধরে
একরোখা শোককৃত্য অপবিত্র একগুঁয়ে ব্যাপার,
পুরুষের অযোগ্য সে শোক :
এ শুধু দেখায় বোধ ভ্রান্তি যা স্বর্গে পরলোকে
দুর্বল হৃদয় এক, অসম্বৃত মন, আর অসঙ্গত সরল ধারণা :
কেননা, যা আমাদের জ্ঞাত, ঠিক তাই হবে, স্বাভাবিক তাই
বুদ্ধির বিচারে তুচ্ছ বিষয়ের মত স্পষ্ট, ঠিক,

তবু কেন মনে রাখা আমাদের স্বতঃমত বিরোধী তফাৎ
কী লজ্জার কথা ! এ যে স্বর্গের বিধানে অপরাধ,
মৃতের নিকটে পাপ, অপরাধ প্রকৃতির কাছে,
অদ্ভুত যুক্তির দায়ে, যে যুক্তির চলিত বিষয়
পিতৃ-পুরুষের মৃত্যু, যা এখনও উচ্চৈস্বরে হাঁকে
আদি শব থেকে আজ যে মরেছে সে পর্যন্ত কাল
'এ তো ঠিক এই হয়।' তাই বলি, অপ্রচল শোকসজ্জাগুলি
দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও ধুলার উপরে, আর মনে করো আমাকে
তোমার
পিতার মতই অন্য : কেননা এ পৃথিবীর সকলে জানুক,
তুমি রাজসিংহাসনে সন্নিকট উত্তরাধিকারী—
প্রিয়তম পিতা তাঁর পুত্রকে যে স্নেহ দেন তার চেয়ে সামান্যও কম
স্নেহ আমি দিই না তোমাকে। এবং তোমার
উইটেনবার্গের বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা আমাদের
কামনার বিপরীত : আর তাই উপরোধ করি
বৎস তুমি হয়ে থাকো নয়নানন্দ, হয়ে আমাদের নয়নপুত্তলী
আমাদের যুবরাজ, রাজপুত্র, পুত্র আমাদের।
রানী : মায়ের প্রার্থনা, হ্যামলেট, পূর্ণ যেন হয়
আমিও বলছি, থাক আমাদের সঙ্গে, না যাস নে উইটেনবার্গ।
হ্যামলেট : মেনে নিই যথাসাধ্য আজ্ঞা আপনার দেবী।
রাজা : বেশ, এই প্রীতি-ধৃত যথার্থ উত্তর :
আমাদের একজন হয়ে রও ডেনমার্কে। এসো, মহারানী,
সুভদ্র ও অনির্বন্ধ হ্যামলেটের সাধ
এখনও আমার মনে মৃদুহাস্যে উপবিষ্ট : তার যথাযোগ্য মর্যাদায়
শুধুমাত্র আনন্দিত পানসভা না-করে ডেনমার্ক
মেঘে মেঘে গর্জমান সুবৃহৎ কামানে জানাবে সে সম্মান
নৃপতির পানোৎসব মেঘলোকে সংবাদ রটাবে
পৃথিবীর বজ্রধ্বনি প্রতিধ্বনি করে। চলো যাই।
[ঝনৎকার। হ্যামলেট ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

হ্যামলেট : ও, এ পেশল সংবদ্ধ মাংস একদিন গলে যাবে
দ্রবীভূত হয়ে যাবে, এক বিন্দু শিশিরে গড়াবে।
না কী, চিরায়ত যিনি তাঁর নীতি স্থিরীকৃত
হয় নাই আত্মবলীদানে! হে ঈশ্বর, ভগবান,
কী ক্লান্ত, বিস্বাদ, স্থূল আর নিষ্ফলতা
মনে হয় পৃথিবীর সর্ববিধ কর্ম, আচরণ।
লজ্জা, ছি ছি, কী যে লজ্জা! এ যে এক বুনোঝোপে আবৃত উদ্যান
যে জঙ্গল বীজ দিতে বেড়ে ওঠে; স্বভাবে যে নীচবৃত্তি স্থূল
সেই শুধু ধরে রাখে সেই বীজ। সে তো ঠিক এই হবে শেষে!
তবুও দুমাস আগে মৃত, না অতও নয়, দু মাসও নয়:
এত মহাশয় রাজা: যিনি এর কাছে
সূর্যদেব অর্ধছাগ কামুক দেবের তুলনায়:
আমার মাতার প্রতি এত প্রেমময়,
সুযোগ দেননি তিনি আকাশের বায়ু রাখে মুখে তার অকরুণ হাত
স্বর্গ ও মৃত্তিকা
স্মরণে নিশ্চয় করে রাখি না কী? কেন বা জননী তাঁকে
স্মৃতিপটে রাখবেন ধরে
যেন ক্ষুধা লেলিহান ক্রমাগত খাদ্যের উপরে:
: এবং তথাপি এক মাসের ভিতরে—
আমি যেন না ভাবি এ সব,—চঞ্চলা রে, তোরই নাম নারী
ক্ষুদ্র এক মাস মাত্র, যে পাদুকা পায়ে মাতা হতভাগ্য পিতার
আমার
শবানুগমন করেছেন সে পাদুকা পুরাতন হবার পূর্বেই,
চিরাশ্রুমতীর মতো অশ্রুময়ী; কেন তিনি, এমন কী তিনিই—
হা ঈশ্বর। পশু এক, সেও চায় যুক্তি আলোচন,
আরও কিছুকাল যার শোক সাজে,—তিনি কিনা বিবাহিত
আমার নিজের
পিতৃব্যের সঙ্গে, যিনি আমার পিতার ভ্রাতা; তবু যা উভয়ে মিল
তুলনায় বজরঙ্গ ও আমি: এ কটি মাসের মধ্যে;
অতীব অসতী অশ্রুজলরাশি বিধৃত লবণ

বিষাক্ত দু চোখে তার উজ্জ্বলতা শুকাবার আগে
বিবাহিত তিনি: হায় অতি ঘৃণ্য দ্রুততায় রতি
এমন কৌশলে স্থির অগম্যাগমনে শয্যাতলে!
এতো ঠিক নয়, ঠিক কখনো হবে না;
কথা কও আত্মগত, হে হৃদয়, কেননা যে রুদ্ধ রাখা
শ্রেয় এ রসনা॥

[হোরেসিও, মারসেলাস ও বার্ণার্ডোর প্রবেশ]

অনুবাদ: তরুণ সান্যাল

শেক্সপীয়রের দ্বিতীয় সনেট

(When forty winters shall besiege thy brow)

চল্লিশ আবর্তে শীত বেষ্টিবে তোমার ভুরু যবে,
গভীর খনিত্রক্ষত তোমার সৌন্দর্যক্ষেত্রে আজি,
অধুনা নয়নরম্য সভ্রান্ত প্রচ্ছদখানি হবে
নিছক আগাছা, যার দাম খুব বেশি নয় জানি,
কোথা তব রূপরাশি রয়ে গেছে, একথা শুধালে,
এবং কোথায় তব রসোচ্ছল সেই সব দিন,
তোমারি নিমগ্ন চোখে, উত্তরে একথা বলা হলে,
জলজ্যান্ত মিথ্যা সে যে স্তাবকতা পরিমিতিহীন।
কৃতার্থ সৌন্দর্য তোর পেত আরো অধিক সন্তোষ
বলতে পারতিস যদি জেনো এ সুন্দর সুত মোর
মেলাবে আমার অঙ্ক, খণ্ডাবে আমার যতো দোষ,
জাতকে বর্তেছে যতো রূপ সে তোমারি সত্বত্তর।
সে তো নব পুনর্নব বৃদ্ধা হয়ে গেছ তুমি যবে,
উষ্ণতা তোমারি রক্তে নিস্তাপ যখন অনুভবে॥

অনুবাদ: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুধাংশু ঘোষ

শেক্সপীয়রের রূপকল্প প্রসঙ্গে

কবিতা অথবা নাটকে সম্পৃক্ত রূপকল্পের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে। সেই রূপকল্পের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে মগ্ন হওয়ার ঝুঁকি অনেক। এই মগ্নতা অবশেষে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে উজ্জ্বল রূপকল্পটিকে কবিতা অথবা নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারে। এই বিচ্ছেদ মারাত্মক, প্রায় একটি জীবন্ত শরীরের কোন অংশ ছুরি দিয়ে কেটে নেবার মতো। তথাপি এই ঝুঁকির বিষয়ে পাঠক এবং সমালোচকদের অনীহার দৃষ্টান্ত অজস্র।

দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পের আদল অপেক্ষাকৃত সহজে ধরা পড়ে বলে এই ধরনের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে মগ্ন হওয়ার প্রবণতা তীব্রতর। একটি কবিতায় কটি ফুলের উল্লেখ আছে তা আঙুল গুণে বলে দিতে অথবা কটি ছবি আছে তা মনের চোখে দেখে নিতে আমাদের কৈশোরেই শেখানো হয়। অমন করে শুনলে অথবা দেখলে কবিতাটির হৃৎপিণ্ড যে থেমে যেতে পারে, একথা অন্তত ওই বয়েসে সাধারণত কেউ বলে না। তাছাড়া দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অন্য ধরনের রূপকল্পগুলির আঘাত মৃদু এবং এমনকি অননুভবনীয় করে তুলতে পারে। একটি কবিতায় জুন মাসের পাতায় ঢাকা এক শীর্ণ নদীর ধ্বনি সারারাত বনভূমি শুনেছে। নদীটি জুন মাসের পাতায় ঢাকা, তবু চোখ বুজে মনের চোখ দিয়ে সেই শীর্ণ নদী দেখে নিতে শেখানো হবে। তার ফলে শ্রবণের প্রতি নদীটির ধ্বনিরূপের আঘাত মৃদু এবং এমনকি অননুভবনীয় হবে। অথচ কবি অবশ্যই চেয়েছিলেন, সেই ধ্বনি সঞ্চারিত হবে পাঠকের মনে।

ভালো কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্প অন্যান্য শ্রেণীর রূপকল্পের সঙ্গে অভিন্নরূপে হয়ে সুন্দরের শরীর গড়ে তোলে। বিভিন্ন শ্রেণীর রূপকল্পের বিচিত্র সংশ্লেষে ঐশ্বর্যময়তার লক্ষণ। নানা জটিল ইন্দ্রিয়াঘাত যেমন কল্পনায় অনুভব করা যেতে পারে, তেমনই সেই আঘাতের প্রত্যেকটি, তা সে যতই তীব্র অথবা

মৃদু হোক, রূপকল্পের মাধ্যমে এক মন থেকে অন্য মনে সঞ্চারিত হতে পারে। শীতলতা, তাপ, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, চাপ, প্রসার্যমাণতা, গতি, ভার, শব্দ ইত্যাদির ইন্দ্রিয়াঘাত কবিতায় কথার অনুষঙ্গ, প্রতীকতা ও ধ্বনিতরঙ্গবাহিত, কিন্তু প্রধানত রূপকল্পাশ্রয়ী।

এসবই, বলা বাহুল্য, কথামালার কথা। তথাপি রূপকল্পের যে-কোনো প্রাথমিক আলোচনায়, শেক্সপীয়রের রূপকল্পের আলোচনায়ও, আরও একবার স্মরণ করা বরং ভালো।

কথার কোনো নির্দিষ্ট মানে নেই; প্রতিবেশী কথা এবং আগে যেসব প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের প্রভাবে কথার মানে বদলায় এবং নতুন করে ঐশ্বর্যময় হয়। আই. এ. রিচার্ডস-এর এই বক্তব্য থেকে উইলিয়ম এমসন শুরু করেছিলেন। কিন্তু শুরুরও শুরু থাকে। রিচার্ডস নিজেই হয়তো ক্রোচের কাছে তাঁর ঋণ লুকোবার তাগিদে ক্রোচের তত্ত্ব বিষয়ে তেতো কথা বলেছেন। কথার দ্ব্যর্থে কাব্যের সৌন্দর্যঅন্বেষী এমসন অনেক কবিতাংশ বিশ্লেষণ করে যে প্রচ্ছন্ন জটিল তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন, প্রথম পাঠে তা চোখে পড়ে না। কিন্তু শুধু দ্ব্যর্থের জন্যেই দ্ব্যর্থের অন্বেষা অকারণ অস্বচ্ছতা ও বিভ্রান্তি আনতে পারে। তাঁর 'সেভেন টাইপস্ অব এ্যাম্বিগুইটি' গ্রন্থে এমসন স্বীকার করেছেন যে তাঁর তত্ত্ব অনুসারে শেক্সপীয়রের একটি সনেটের বিশ্লেষণ অস্বচ্ছতা এনেছে। তাহলে এই বিশ্লেষণ অন্তত মাঝে মাঝেই সৌন্দর্য উপলব্ধির বাধা হবে এমন আশঙ্কা করা সঙ্গত।

এমসন অবশ্য স্পষ্ট করে বলেছেন, শুধু দ্ব্যর্থই সৌন্দর্য নয়; এক বিশেষ ধরণের দ্ব্যর্থে কাব্যের সৌন্দর্য নিহিত। এই বিশেষ ধরণের দ্ব্যর্থের সংজ্ঞা লক্ষ্য করলে মনে হবে, কবির ভাবনার প্রকৃতিই আসল কথা এবং তখন আর দ্ব্যর্থের তত্ত্বের বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকবে না।

এমসনের বক্তব্য অনুসারে একটিমাত্র কথার অজস্র সম্ভাবনা শেক্সপীয়রের এক-একটি নাটকে উপস্থাপিত। যেমন 'ওথেলো' নাটকটিতে 'সততা' কথাটির অজস্র সম্ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। এলিজাবেথের কালে নিচু শ্রেণীর মধ্যে কথাটির যে সব অর্থ ছিল সেই সব অর্থে ইয়াগোর চরিত্রে সততা রয়েছে। ভিন্ন অর্থে 'সততা' ওথেলোরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নাটকটির দুই প্রধান চরিত্রের বিরোধ শুধু 'সততা' কথাটির বিভিন্ন অর্থবিধৃত।

এমসনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'ওথেলো'-র মতো একটি গভীর জটিল

নাটক বড় বেশি সরল মনে হবে। এই সরলীকরণে ইয়াগো ছাড়া অন্যান্য চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনীবয়ন ইত্যাদির আশ্চর্য নিপুণতা উপেক্ষিত। এমসনের তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা যায়, কথার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ সমালোচনার অন্যতম লক্ষ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু তা-ই সাহিত্য সমালোচনা নয়।

এমসন এবং ক্যারলিন স্পার্জনের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, তবু এই দুজনের মধ্যে দূরত্ব অসেতুবন্ধন নয়। এমসন এক-একটি মৌল কথায় শেক্সপীয়রের এক-একটি নাটকের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছেন এবং স্পার্জন এক-একটি রূপকল্পে প্রায় তা-ই পেয়েছেন। অবশ্য এমসনের তুলনায় স্পার্জনের দাবি অনেক বিনীত।

শ্রীমতী স্পার্জন বিশ্বাস করেন, নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব, মেজাজ ও মানসের আদল তাঁর সাহিত্যকর্মেই মেলে, তাঁর জীবনীতে মেলে না। একজন কবি প্রধানত তাঁর রূপকল্পের মাধ্যমে কিছুটা নির্জ্ঞানে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই কবি শেক্সপীয়রের মতো নাট্যকার হলে তিনি তাঁর সৃষ্ট পাত্রপাত্রীদের থেকে এবং তাদের দৃষ্টিকোণ ও মতামত থেকে নিজেকে যতই দূরে রাখুন, তীব্র আবেগে কম্পিত মুহূর্তে তাঁর হৃদয় থেকে কিছুটা নির্জ্ঞানে উৎসারিত রূপকল্প প্রবাহে নিজেকে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে যা-কিছু তাঁর অভিজ্ঞতাবিধৃত হয়েও বিস্মৃত, আবেগের আঘাতে উত্তরঙ্গ মুহূর্তে উৎসারিত রূপকল্পে তারই প্রতিভাস।

এই বিশ্বাস নিয়ে স্পার্জন শেক্সপীয়রের নাটকের রূপকল্পগুলিকে বেছে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন। রূপকল্পের সংজ্ঞা দিতে তিনি চান নি। একটি মিলের ভিত্তিতে দুটি ভিন্ন জিনিস অথবা ভাবনার মধ্যে স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্ন তুলনাকে তিনি রূপকল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। অবশ্য রূপকল্পের আঘাত যে শুধু দৃষ্টিতে নয় এ বিষয়ে তিনি খুব সচেতন। তাঁর বিশ্বাস, কোনো কবি অথবা গদ্যলেখক তাঁর ভাবনাকে রূপায়িত, উদ্ভাসিত ও অলঙ্কৃত করতে যে বাক-প্রতিমা ব্যবহার করেন তাকেই রূপকল্প হিসেবে মেনে নিলে ক্ষতি নেই।

শেক্সপীয়রের নাটকের রূপকল্পগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করে স্পার্জন প্রথমত নাট্যকারকে জানতে চেয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি নাটকে নতুন আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এক-একটি নাটকে একটি রূপকল্প বারবার এসেছে। একটি রূপকল্পের বারবার ব্যবহারে সামান্য ভাষান্তর অনুল্লেখ্য। একটি রূপকল্পের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ নাটকটির মৌল আবেগ বারংবার তরঙ্গায়িত ও তীক্ষ্ণমুখ করেছে। যেমন 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট'

নাটকটির সারাৎসার আলোর রূপকল্পাশ্রয়ী। অন্ধকার পৃথিবীতে এই আলো নানারূপে প্রসারিত।

স্পার্জনের পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ম্যাকবেথ' নাটকটিকে বেছে নিলে দেখা যাবে তিনি নাটকটির চারটি প্রধান রূপকল্প চিহ্নিত করেছেন। এই চারটি রূপকল্প নাটকটিতে বারংবার ব্যবহৃত। প্রথমত নায়ক ম্যাকবেথ বেমানান পোশাকের ভারে মৃদুগতি এক ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত। বেমানান পোশাকের রূপকল্প নাটকটিতে অজস্রবার এসেছে। স্পার্জন দেখিয়েছেন, এই বেমানান পোশাকের ভারে, মৃদুগতি ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিটি ম্যাকবেথের চরিত্র সম্বন্ধে কোলরিজ ও ব্র্যাডলির মতো সমালোচকের ধারণার সঙ্গে মেলে না। কোলরিজ ও ব্র্যাডলি ম্যাকবেথকে বিরাটত্বে মিলটনের শ্লেটানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্পার্জন মেনে নিয়েছেন, সাহসে, আবেগে, অনিরুদ্ধ উচ্চাশায়, কল্পনাশক্তিতে ও অনুভবের তীক্ষ্ণতায় ম্যাকবেথ নিঃসন্দেহে খুবই বড়, না হলে তো ট্র্যাজেডিই হত না। কিন্তু তিনি মনে করেন, হ্যামলেট অথবা ওথেলোর পাশে দাঁড়াবার মতো মহত্ত্ব ম্যাকবেথের নেই। বেমানান পোশাকের ভারে মৃদুগতি এক ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তির রূপকল্পের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যেভাবে ম্যাকবেথ বারবার নাটকটিতে উপস্থাপিত, শেক্সপীয়র নিজে তাকে সেইরূপেই 'দেখেছেন'।

বিপুল বিস্তারে এবং পৃথিবীর প্রত্যন্ত পার হয়ে অধীর শূন্যে ধ্বনির কম্পিত তরঙ্গায়িত প্রতিধ্বনি 'ম্যাকবেথ' নাটকটির দ্বিতীয় প্রধান রূপকল্প। প্রতিধ্বনি ও বিচ্ছুরিত আলো সব সময় শেক্সপীয়রের প্রিয়। তাঁর নাটকগুলিতে এই পক্ষপাতিত্বের অনেক নজির ছড়িয়ে আছে। ম্যাকবেথ দুঃসহ যন্ত্রণায় উপলব্ধি করেছে, ডানকানের হত্যার কাহিনীর তরঙ্গায়িত প্রতিধ্বনি পৃথিবীর প্রত্যন্ত পার হয়ে অসীম শূন্যে কম্পিত হবে। ম্যাকবেথের নৃশংসতা বর্ণনায় ম্যাকডাফের কথা একই প্রতিধ্বনির রূপকল্পাশ্রয়ী।

অন্ধকার 'ম্যাকবেথ'-এর তৃতীয় প্রধান রূপকল্প। আলোয় জীবন ও কল্যাণ প্রতিভাত এবং অন্ধকারে মৃত্যু ও শয়তানি—এই সরল প্রতীকতা থেকে অন্ধকারের রূপকল্প এই নাটকে বারবার এসেছে। এই সরল প্রতীকতা থেকে এই ভাবনা রূপকল্পবিধৃত হয়ে বারবার প্রযুক্ত হয়েছে যে, ম্যাকবেথের নৃশংসতা চোখের পক্ষে অসহ্য, তাই অন্ধকার অথবা আংশিক অন্ধত্ব প্রয়োজন। এই কারণে ম্যাকবেথ তারার আলো নেভাতে ব্যাকুল, এই কারণে ম্যাকবেথ

ও তার স্ত্রী নিজের নিজের চরিত্র অনুসারে গভীর অন্ধকারকে আহ্বান করেছে। প্রতিক্রিয়া শুরু হবার পর যে-আলো লেডি ম্যাকবেথ সব সময় কাছে রেখেছে, তা বরং এই অন্ধকারকে গভীরতর করেছে।

পাপ একটা ব্যাধি, স্কটল্যাণ্ড ব্যাধিগ্রস্ত—শেক্সপীয়রের এই প্রিয় ভাবনা 'ম্যাকবেথ' নাটকের চতুর্থ প্রধান রূপকল্প। ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের রূপকল্পের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্তক্ষরণের ভাবনা এসেছে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের অন্ধকার প্রেক্ষিতে রক্তের রূপকল্পও বারবার সম্পৃক্ত।

শেক্সপীয়রের নাটকে রূপকল্পগুলি বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্নভাবে প্রযুক্ত নয়। এক-একটি নাটকে এক-একটি প্রধান রূপকল্পের পুনরাবৃত্তি পটভূমি ও পরিবেশ তৈরি করে এবং নাটকের মৌল আবেগ তরঙ্গায়িত ও তীক্ষ্ণমুখ করে। শ্রীমতী স্পার্জনের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। তাঁর রূপকল্পের শ্রেণীবিন্যাস শেক্সপীয়রের নাট্যশিল্পের শৈলী উপলব্ধিতে অবশ্যই সাহায্য করে। কিন্তু যদি দাবি করা হয়, রূপকল্পই শেক্সপীয়রের নাটকের তাৎপর্য বিষয়ে শেষ কথা এবং একটি বিশেষ রূপকল্পের পৌনঃপুনিকতায় একটি নাটকের মৌল ভাবনা অথবা আবেগ প্রতিফলিত, তাহলে নাট্যসমালোচনার এবং সাধারণভাবে সাহিত্যসমালোচনার পরিধি সঙ্কুচিত করা হবে। তাছাড়া জটিল নাটকের উপলব্ধিতে শ্রীমতী স্পার্জনের পদ্ধতি ভুল পথের দিকেও তর্জনীসংকেত করতে পারে। যেমন বেমানান পোশাকের ভারে মৃদুগতি কোনো ব্যক্তি হাসির উৎস, বিষাদান্ত নাটকের নায়ক নয়। পোশাক বাইরের জিনিস, কিন্তু ম্যাকবেথের শয়তানি তার অন্তর্নিহিত।

উইলসন নাইট ঠিক ক্যারলিন স্পার্জনের মতো রূপকল্পের 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণে আগ্রহী নন, তিনি গভীর অর্থে শেক্সপীয়রের জীবনদৃষ্টির ভাষ্যকার। নাটকের কাব্যিক তাৎপর্য তাঁর প্রধান আলোচ্য। ঘটনা অথবা কাহিনীর ক্রমবিকাশ অথবা চরিত্রায়ণ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেনি, তিনি এই সবের উৎসে যে শিল্পীমানস তার ব্যাখ্যায় মগ্ন। নাটকে উপস্থাপিত কোন উত্তরঙ্গ ক্ষণকাল চিরকালীনতায় সম্পৃক্ত হয়ে জীবন ও মৃত্যুর কোন্ সত্যের আবরণ তুলে নেয়, প্রতীকতা ও রূপকল্পের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে চিহ্নিত করা উইলসন নাইটের লক্ষ্য।

নাইট তাঁর 'দি শেক্সপীরিয়ান টেম্পেস্ট' বইটিতে তীক্ষ্ণভাষিতায় বিশিষ্ট। এখানে তাঁর বক্তব্যে কোনো কুয়াশার আস্তরণ নেই। এখানে তিনি দেখিয়েছেন,

শেক্সপীয়রের প্রত্যেকটি নাটকের ক্ষণকালের বৃত্তে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত এসেছে এবং এই সংঘাত অবসিত হয়ে সুশৃঙ্খলা ফিরে এলে সেই ক্ষণকালের বৃত্ত চিরকালীনতায় সম্পৃক্ত হয়েছে। শেক্সপীয়রের নাটকে বিশৃঙ্খলা ও সুশৃঙ্খলার, মৃত্যু ও জীবনের, অন্ধকার ও আলোর, অশান্তি ও শান্তির, অসুন্দর ও সুন্দরের বিরোধ 'ঝড়ের' ও 'সঙ্গীতের' রূপকল্পে উপস্থাপিত। শেক্সপীয়রের জীবনদৃষ্টিতে সঙ্গতি ও অসঙ্গতির, প্রেম ও অপ্রেমের এক পরম প্রত্যয় রয়েছে। বিভিন্ন নাটকের বিচিত্র বর্ণালী সেই এক চরম প্রত্যয়ের প্রতিভাস। এই কারণে লীয়র-এর চরিত্রে 'কিং লীয়র' নাটকটির হৃদয়ের স্বাদ মিলবে না; সেই স্বাদ মিলবে ঝড়ের ও সঙ্গীতের সংঘাতে। 'এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' ছাড়া শেক্সপীয়রের অন্য সব নাটক সম্বন্ধে উইলসন নাইটের এই একই বক্তব্য। নাইটের সঙ্গীতের ও ঝড়ের রূপকল্পকে রম্য রূপকল্প ও রুদ্র রূপকল্প বললে হয়তো আরও সঙ্গত, অর্থবহ ও সহজবোধ্য হয়। কিন্তু 'রুদ্র' কথাটির আর বিশেষ ধার নেই, কথাটি অপব্যবহারে জীর্ণ।

উইলসন নাইটের সমালোচনার রীতি 'ম্যাকবেথ' নাটকটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নিলে স্পষ্ট হবে। বিশৃঙ্খলা ও মৃত্যু 'ম্যাকবেথ' নাটকে পরম্পরা ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। এই নাটকে ঝড় অত্যন্ত হিংস্র। শুরুতেই সার্জেন্ট-বর্ণিত বিদ্রোহ ঝড়ের রূপকল্পবিধৃত। যে তিন অতিপ্রাকৃত চরিত্র ম্যাকবেথের ভাগ্য বলে দিতে বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টিতে অপেক্ষা করছে তারা ঝড়ের প্রতিমূর্তি। তাদের একজন এক নাবিককে নির্যাতন করবে। নাবিকটির জাহাজের নাম 'দি টাইগার'। একটি জাহাজের এই নাম 'টুয়েল্‌ফ্‌থ নাইট' নাটকটিতেও রয়েছে। জাহাজের নামের ওই ব্যাঘ্রে ঝটিকার হিংস্রতা রূপায়িত।

ডানকান-হত্যার রাত্রিতে ঝড়ের আঘাতে জীবনের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরেছে। এমন ঝড় লেনক্সের অভিজ্ঞতায় নেই। হিংস্র জন্তু ঝড়ের অথবা রুদ্রের প্রতীক। ডানকান-হত্যার রাত্রির ভয়ঙ্কর ঝড় অনেক হিংস্র জন্তুতেও রূপায়িত। ওই রাত্রিতেই হত্যার আগে বিশিষ্ট অতিথিকে আপ্যায়নের আয়োজনে সঙ্গীতের সুষমা রয়েছে।

ভাগ্যের আয়নায় ভবিষ্যতের ছায়া দেখে নিতে ম্যাকবেথ পাহাড়ের নির্জন গুহায় আবার সেই অতিপ্রাকৃত ত্রয়ীর কাছে এলে পরপর তিনটি ছায়ারূপ তার দৃষ্টিকে আঘাত করবে। এই দৃশ্যে একটি সশস্ত্র মুণ্ড, এক রক্তাক্ত শিশু ও এক মুকুট-পরা শিশুর ছায়ারূপে ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও জীবনের সংঘাত

প্রতিফলিত। সশস্ত্র মুণ্ডটি ম্যাকবেথের নিজের ছায়ারূপ। ডানকানকে হত্যা করে স্কটল্যাণ্ড থেকে, মানবতা থেকে, জীবন থেকে খণ্ডিত হয়ে ম্যাকবেথ নিজেকে শুধুই অস্ত্র দিয়ে সাজিয়েছে। রক্তাক্ত শিশুর ছায়ারূপ মৃত্যু থেকে উৎসারিত-জীবনের প্রতীক। মুকুট-পরা শিশুর ছায়া জীবনের জয়ের প্রতীক। এই দৃশ্যেরই শেষের দিকে আট রাজার ছায়ামিছিল ম্যাকবেথের আহত চোখের সামনে সঙ্গীতের কম্পিত তরঙ্গে অপস্রয়মান। এই সঙ্গীতসৃষ্টিও জীবনের। ঝড় ও সঙ্গীতের রূপকল্পাশ্রয়ী মৃত্যু ও জীবনের এই সংঘাত অনন্তকালের সমুদ্রে একটিমাত্র ঢেউ।

উইলসন নাইটের রীতি শেক্সপীয়রের নাটকের তাৎপর্য উপলব্ধিতে প্রচুর সাহায্য করে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটিমাত্র রূপকল্পে অথবা প্রতীকে একটি নাটকের সারমর্ম খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা সব সময় সার্থক হতে পারে না। নাইটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দুটি নাটকের স্বাতন্ত্র্য দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে পড়ে। বিষাদান্ত এবং মিলনান্ত নাটকের মধ্যে পার্থক্যও অস্পষ্ট হয়ে যায়। নিজের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নাইট শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের অনেক অংশের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর 'এ্যান্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা'-র ভাষ্য সানন্দে গ্রহণ করা সহজ নয়। শেক্সপীয়রের নাটকের সমালোচনায় রূপকল্পের ব্যাখ্যা যে লক্ষ্যে পৌছবার অন্যতম পথ, রূপকল্প অথবা প্রতীকের ব্যাখ্যাই যে লক্ষ্য নয়, এই অনস্বীকার্য কথাটি নাইটের পদ্ধতিতে উপেক্ষিত।

স্টোল এবং অপর কয়েকজন সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে, এলিজাবেথীয় মানসের সঙ্গে উইলসন নাইটের ব্যাখ্যার কোনো সাযুজ্য নেই। এই অভিযোগ ধোপে টেকে না। এলিজাবেথীয় কবিতার তুলনায় সমালোচনা অনেক পিছিয়ে ছিল। শেক্সপীয়রের নাট্যকলার ব্যাখ্যা তাঁর যুগের উপলব্ধির বৃত্তে সীমিত করা চলে না।

এডওয়র্ড এ. আর্মস্ট্রং চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত তাঁর 'শেক্সপীয়র্স ইম্যাজিনেশন' বইটিতে কয়েকটি পরস্পরসংযুক্ত রূপকল্প বেছে নিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন নাটকে এই রূপকল্পপুঞ্জের পুনরাবৃত্তি শেক্সপীয়রের শিল্পীমানসে আলোকপাত করে। আর্মস্ট্রংয়ের বইটির প্রকাশকালের দু'বছর পরে প্রকাশিত 'দিস গ্রেট স্টেজ' গ্রন্থে আর. বি. হেলম্যান 'কিং লীয়র' নাটকটির রূপকল্প সযত্নে বিশ্লেষণ করেছেন। নাটকটির গঠনের

সঙ্গে রূপকল্পের সম্পর্কসন্ধান তাঁর লক্ষ্য। একই সময়ে 'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ' এবং অন্যান্য নাটকের রূপকল্প বিষয়ে রয় ওয়াকার দু-খানি গ্রন্থে ও বহু প্রবন্ধে সার্থক আলোচনা করেছেন।

ক্যারলিন স্পার্জনের 'শেক্সপীয়র্স ইমেজারি' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তিরিশের দশকের মধ্যভাগে। তার ঠিক এক বছর পরে উল্‌ফ্‌গ্যাং ক্লেমেন শেক্সপীয়রের নাট্যকাহিনীর বিকাশে রূপকল্পের ভূমিকা বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। স্পার্জনের তুলনায় তাঁর পদ্ধতি কম 'বিজ্ঞানসম্মত', কিন্তু স্পার্জনের বইটিতে যে একটা অভাববোধ ছিল, বলা যায়, ক্লেমেনের আলোচনায় তা অবসিত।

● শ্রীঅমলেন্দু বসুর প্রবন্ধটি দেরীতে পাওয়ায় এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না। এই প্রবন্ধটি এবং শেক্সপীয়র সম্পর্কে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক **পরিচয়**

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চে শেক্সপীয়র

মঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকাভিনয়ের কথা উঠলেই চার্লস ল্যামের সেই বিখ্যাত উক্তি স্বতই মনে পড়ে :

"The plays of Shakespeare are less calculated for performance on a stage than those of any other dramatist whatever."

এই উক্তির সমর্থনে এখন বোধকরি বহুজনই সাড়া দেবেন। শেক্সপীয়রের নাটকের রসাস্বাদের জন্য চোখে দেখার চেয়ে মনে ভাবাই শ্রেয়, এমন একটি ধারণাই অধুনা প্রচলিত। কিন্তু এমন ধারণা শেক্সপীয়রের নিজের মনে প্রশ্রয় পায় নি। পেলে বোধকরি নাটক লেখা তাঁর কোনোদিনই ঘটে উঠত না। কারণ তিনি নাটক লিখেছেন নেহাতই জীবিকার প্রয়োজনে এবং তাঁর নাটকের মঞ্চসাফল্যের ওপর এই প্রয়োজন বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য তাঁর যুগের মঞ্চ আমাদের যুগের থেকে অনেক পৃথক ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

সে যুগের মঞ্চ ছিল অনেকটাই খোলামেলা; দর্শকের অনেক কাছাকাছি। সামনে ও দুই পাশে কোনো পর্দার আয়োজন ছিল না; আঁকা দৃশ্যপটও অনুপস্থিত। স্ত্রীভূমিকায় স্বল্পবয়সী ছেলেরাই অভিনয় করত। দর্শকের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। খোলা মঞ্চের তিনদিক ঘিরে তারা অভিনেতাদের অতি নিকটেই থাকত। মঞ্চের এই প্রকৃতি যে নাটকের চরিত্র ও অভিনয়ের রীতির ওপর সুগভীর ছাপ রেখেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পট পরিবর্তনের প্রচলন না থাকায় নাটকে আসত দ্রুতগতি; নায়িকার পুরুষবেশ ধারণও অতিপ্রচলিত ছিল এবং দৃশ্যপটের অনুপস্থিতির জন্য নাটকে কাব্য ও কল্পনার আশ্চর্য স্ফূর্তি সম্ভবপর হয়েছিল। সেদিনের প্রচলিত অনেকগুলি নাটুকে দলের মধ্যে একটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন শেক্সপীয়র, প্রধানত নট ও নাট্যকার হিসাবে। দলের

সবচেয়ে খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন রিচার্ড বারবেজ। তাঁর দক্ষতা ছিল মুখ্যত ট্রাজিক চরিত্রাভিনয়ে। সেকালে অভিনয়দক্ষতা নির্ভর করত বাচনভঙ্গি ও প্রত্যঙ্গ চালনার ওপর। নিরাবরণ মঞ্চের তিনদিকে বেষ্টিত দর্শককুলকে অভিভূত করতে আর কীই বা উপায় ছিল? এই ধরনের অভিনয়ে দর্শকমন কতদূর তৃপ্ত হত তার কিছুটা পরিচয় পাই Francis Meres-এর Palladis Tamia থেকে; নাট্যকার Ben Jonson প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে এবং সহ-অভিনেতা Heminge ও Condell-এর সপ্রশংস উক্তি থেকে। ভাগ্যের আনুকূল্যও অবশ্য শেক্সপীয়র পেয়েছিলেন। অন্যান্য প্রতিভাধর নাট্যকারগণ একে একে গত হলেন। ফলে অতি অল্প দিনেই শেক্সপীয়র খ্যাতির বিজয়মাল্য অর্জন করেছিলেন। আর এক সময়ে তাঁর খ্যাতি যে সকলকে ছাড়িয়ে শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিল সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

১৬২৩ খৃঃ পুস্তকাকারে শেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তেই থাকে এবং খ্যাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পিউরিটান আমলে মঞ্চগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহতই থাকে। পিউরিটান আমলের কিছু আগে মঞ্চে তাঁর জনপ্রিয়তা Fletcher ও Massinger-এর কাছে অবশ্য কিছু ন্যূন হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি বন্ধ হয় নি, বরং বেড়েই চলেছিল। প্রমাণ পাই D' Avenant, Suckling ও মিলটনের রচনায়। সুতরাং Restoration যুগে মঞ্চগুলি যখন আবার দরজা খুলল ও পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হল তখন শেক্সপীয়রের নাটকগুলির পুনরভিনয়ে মোটেই আশ্চর্য হই না। এই যুগে শেক্সপীয়রের প্রতি মনোভাবের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই ড্রাইডেনের রচনায়। এই রচনাটিকে সমকালীন মনোভাবের নিখুঁত ছবি হিসাবে বলাই সঙ্গত। একদিকে আছে Jonson ও Massinger ইত্যাদির তুলনায় শেক্সপীয়রের তথাকথিত ত্রুটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ অন্যদিকে Greek নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর তুলনা এবং নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভা যে নাটকরচনার সব আইনকে অগ্রাহ্য করেই আপন মহিমায় ভাস্বর তার নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি।

আসল কথা Restoration যুগ শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তার দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারে নি। একদিকে পাই Aristotle-এর রচনার বিকৃত

ব্যাখ্যানুযায়ী নাটকরচনার আইনগুলি শেক্সপীয়র মানেন নি বলে তাঁর রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর নয় এমন একটি মনোভাব। অন্যদিকে রসের বিচারে তাঁর নাটক যে অপূর্ব সে কথাটিও কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি। এই দ্বিধা ও সংশয়ের পেছনে যে সমকালীন রুচির পরিবর্তন সক্রিয় ছিল সেটি অবশ্যই স্মর্তব্য। নাটকের দর্শকের সংখ্যা রাজসভাকে কেন্দ্র করে যারা ঘুরে বেড়াত প্রায় তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নট ও অন্যান্য নাট্যকাররাও এদেরই অন্তর্গত ছিলেন। রাজার আনুকূল্যে এঁদের মধ্যে সমকালীন ফরাসী নাটকের আইন-মানা আদর্শই প্রচলিত ছিল এবং অন্যদিকে জীবনের গভীর সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে এক ধরনের তরল রসিকতাই তাঁদের বেশি রুচিকর ছিল। ফলে মঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে পরিবর্তিত আকারে উপস্থাপিত করা হল। এমনকি কিছু রসালো প্রেমকাহিনীও সংযোজন করা হল দর্শকমনকে তৃপ্ত করতে। কমেডির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল *The Merry Wives of Windsor*. ট্রাজেডির মধ্যে *Hamlet* ও *Othelo* ছাড়া অন্যগুলিকে পরিবর্তন করা হয়। Nahum Tate পরিবর্তন করলেন *King Lear*-কে, এবং ciffer করলেন *Richard III*-কে। মোটকথা শেক্সপীয়রের নাটক এই যুগের মঞ্চে রীতিমতো অভিনীত হয়েছে; দর্শকমনকে তৃপ্ত করেছে যদিচ নাট্যকাররা যুগের রুচির তাগিদে এই সব নাটকের অঙ্গচ্ছেদও করেছেন।

এই যুগের বিখ্যাত নট বেটারটন যিনি শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিগুলিতে অভিনয় করেই খ্যাতি সঞ্চয় করেছিলেন। এই যুগের মঞ্চেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। আলোর বন্দোবস্তের সঙ্গে এসেছিল মঞ্চের মাথায় ছাদ এবং আঁকা দৃশ্যপট। স্ত্রীভূমিকায় ছেলেদের বদলে মেয়েরাই অভিনয় করতে শুরু করলেন। বিখ্যাত মঞ্চগুলির মধ্যে নাম করা যায় Drury Lane ও Covent Garden-এর। এরা উভয়েই শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করে যথেষ্ট সুনাম কিনেছিল। এলিজাবেথীয় যুগের মঞ্চের সঙ্গে এদের পার্থক্য থাকলেও এলিজাবেথীয় যুগের Blackfriar-জাতীয় মঞ্চের সঙ্গেই এদের নিকট আত্মীয়তা। অর্থাৎ এই মঞ্চগুলিও কিছুটা খোলামেলা ও দর্শকের অনেক কাছাকাছি ছিল। ফলে নট ও দর্শকের মধ্যে সম্পর্ক আমাদের যুগের মতো সম্পূর্ণ সুদূর হয়ে যায় নি।

নট হিসাবে বেটারটন ছিলেন শক্তিমান ও জনপ্রিয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত

অভিনয়ধারা তাই প্রভাবিত করল উইলবাস, বার্টন বুথ, কলি সিবার ইত্যাদি অন্যান্য নটেদের। কিন্তু এই অভিনয়ধারায় কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম ও অন্যান্য আতিশয্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে কেমন প্রাণহীন ও আড়ষ্ট বলে বোধ হতে লাগল। এই আড়ষ্টতা ও প্রাণহীনতাকে দূরে সরিয়ে চরিত্রাভিনয়ে প্রাণের সাড়া আনলেন অভিনেতা গ্যারিক। তাঁর মৌলিকতা স্বাভাবিকতায়, আতিশয্যের বর্জনে। একাধারে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গ্যারিক ট্রাজিক চরিত্রাভিনয়ে নব্যরীতির প্রবর্তন করলেন; সাধারণের মধ্যে শেক্সপীয়র প্রতিভাকে বোধগম্য ও মর্মস্পর্শী করলেন আর বহু বিভিন্ন ও অনন্য চরিত্রকে রূপায়িত করে আপন অভিনয়প্রতিভার বিরাট স্বাক্ষর রাখলেন। তাঁর কীর্তির মধ্যে শেক্সপীয়র লিখিত বহু নাটকের অভিনয়ের জন্য পুনরুজ্জীবনই শুধু পড়ে না, Restoration যুগের বহু অপকৃষ্ট পরিবর্তনের বর্জন ও তাদের মৌলিক ও যথাযথরূপে পুনরাবির্ভাবও তার মধ্যে গণ্য। অবশ্য একথা সত্য কিছু কিছু নাটককে খুশিমতো পরিবর্তন করতে তিনিও দ্বিধা করেন নি, কিন্তু তবু মঞ্চের মাধ্যমে শেক্সপীয়রকে অসাধারণ জনপ্রিয় করতে তাঁর দান যে অপরিসীম সে কথা স্বীকার করতেই হবে। অভিনয়ে মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখলেন অন্যান্য নটনটিদের প্রভাবিত করে। মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী ক্লাইভ, শ্রীমতী সিবার ও শ্রীমতী প্রিটচার্ড তাঁর কাছে ঋণী; যেমন ঋণী ম্যাকলীন যিনি শাইলককে ট্রাজিক চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করলেন। হিণ্ডারসন বিখ্যাত হলেন ফলস্টাফের ভূমিকায় আর জন পামার নানা ছোট ভূমিকাকে অমর রূপ দিয়ে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করলেন।

গ্যারিক মঞ্চ হতে অবসর নিলেন ১৭৭৬ খৃঃ। তাঁর পরে তাঁর স্থান দখল করলেন জন ফিলিপ কেম্বল। প্রথমে Drury Lane ও পরে Covent Garden-এর ম্যানেজার হিসাবে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন; এখন অভিনেতারূপে দক্ষ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটল তাঁর মধ্যে। ইতিমধ্যে ১৮০৮-৯ সালে উপরোক্ত দুটি থিয়েটর গৃহই পুড়ে যাওয়ায় তাদের আবার নতুন করে বৃহৎ আকারে নির্মাণ করা হল। দর্শক সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধিই অবশ্য এর জন্য দায়ী। মঞ্চের এই আধুনিকীকরণ ও অতিবৃহৎ আকৃতি অভিনয়-রীতিতে অনিবার্য পরিবর্তন আনল।

কেম্বল ও তাঁর ভগ্নী শ্রীমতী সিডনস এই নব্য অভিনয়রীতির স্রষ্টা।

এই রীতির মুখ্য কথাটা ছিল অভিনয়ে কিছুটা সাদাসিধা ভঙ্গির প্রয়োজনের স্বীকৃতি ও কাব্যাংশগুলিকে উচ্চগ্রামে হলেও মন্থরগতিতে উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা। নতুন মঞ্চের আধুনিক চরিত্র এর জন্য দায়ী। এলিজাবেথীয় যুগ থেকে প্রচলিত মঞ্চের সামনেকার খোলা অংশটির পরিপূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছিল; দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এসেছিল দীর্ঘ দূরত্ব। দূরস্থিত দর্শকদের তৃপ্ত করতে উচ্চভাষণের আতিশয্য তাই অনিবার্য ছিল। নব অভিনয়ধারায় কেম্বলকে ছাড়িয়ে গেলেন এডমাণ্ড কীন। তাঁর হাতে শেক্সপীয়র অভিনয়-পদ্ধতি রোমান্টিক চরিত্র অর্জন করল। অঙ্গভঙ্গি ও উচ্চভাষণের আতিশয্য, চোখধাঁধানো আলো, দৃশ্যপট ও সঙ্গীতের ব্যবহার এবং নাটকে বর্ণিত কালের উপযোগী আবহাওয়াকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার দিকে ঝোঁক দেখা গেল। এই নতুন ঝোঁকের স্রষ্টা হিসাবে নাম করতে হয় চার্লস কীন ও ম্যাকরীডির। ১৮৫১ খৃঃ ম্যাকরীডির অবসর গ্রহণের পরে একচ্ছত্র আধিপত্য পেলেন চার্লস কীন। Princess Theatre মঞ্চে চলল নতুন রোমান্টিক অভিনয়কলার বিজয়াভিযান।

কীন তাঁর নতুন ধারার পরাকাষ্ঠা দেখালেন *The Winter's Tale*-এর অভিনয়ে। মঞ্চে উপস্থিত করলেন গান, নাচ, বিরাট বিরাট চোখ-ঝলসানো দৃশ্যপট। ডিয়োনিসাসের উৎসবকে জীবন্তরূপে উপস্থাপিত করার জন্য তিনশ নর্তকের দলকে মঞ্চে স্থাপন করে মঞ্চৈশ্বর্যের চূড়ান্ত দেখালেন। বাদ পড়ল যেটুকু সেটুকু নিঃসন্দেহেই মূল্যবান; সেটুকু শেক্সপীয়র লিখিত নাট্যরস। চোখ ও কানকে তৃপ্ত করতে গিয়ে নাটককে কেটে ছিঁড়ে ও দৃশ্যগুলির পুনর্বিন্যস্ত করে শেক্সপীয়রকে এক অদ্ভুত আকারে উপস্থিত করা হল।

এই দুর্দিনে আলোর রেখা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল না। ১৮৪৩ খৃঃ Drury Lane ও Covent Garden-এর মঞ্চাভিনয়ে একাধিপত্য শেষ হল। ফলে লণ্ডন শহরের কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার নাট্যশালাও মঞ্চাভিনয়ে অধিকার পেল। তাদের পক্ষে বৃহদায়তন মঞ্চদুটির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না; তাই তারা দর্শকদের চমৎকৃত করার দিকে মন না দিয়ে শেক্সপীয়র-সৃষ্ট নাট্যবস্তুর যথাযথ উপস্থাপন ও আবেদনে আস্থা রাখলেন। ১৮৪৪ খৃঃ হে মার্কেট মঞ্চে বেঞ্জামিন ওয়েবস্টার যখন *The Taming of the Shrew*-কে উপস্থাপিত করলেন, তখন তাঁর নজর ছিল শেক্সপীয়র লিখিত অখণ্ড নাটকটিকেই উপস্থাপিত করা; তাই শুধু পর্দা ও স্থাননির্দেশক বোর্ড ব্যবহার

করে দৃশ্যপটকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। ঠিক একই সময়ে Saddler's Wells নামক মঞ্চের মালিক হলেন স্যামুয়েল ফেল্পস। তিনি বিশ বছরের মধ্যে সাতখানি বাদে শেক্সপীয়রের সমস্ত নাটকেরই মঞ্চরূপ দিলেন। তাঁর প্রযোজনায় নাটকের আসল রূপ অবিকৃত রইল। মঞ্চৈশ্বর্যের আতিশয্য বর্জিত হল; দৃশ্যপটের ব্যবহার অনেক সরল ও সীমাবদ্ধ হল। অবশ্য এই ক্ষুদ্রাকার মঞ্চগুলি বৃহদায়তন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাশে নেহাৎ নিষ্প্রভ ছিল; ফ্যাশনদুরস্ত বৃহদায়তন মঞ্চে নব্য রোমান্টিকধারা কিন্তু অপ্রতিহত গতিতেই এগিয়ে চলল।

ভিক্টোরীয় যুগের শেষার্ধেও এই ধারারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চার্লস কীন মারা গেলেন ১৮৬৮ খৃঃ এবং তার দশ বছর পরে ফেল্পসেরও প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে শেক্সপীয়র অভিনয়ের একাধিপত্য পেলেন হেনরি আর্ভিঙ। তাঁর প্রযোজনায় শেক্সপীয়রের নাটক যে-রূপে আবির্ভূত হল তা বোধকরি কেম্বল ও কীনেরও স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দর্শককে অভিভূত করা কাব্যের আবেদনে নয়, দৃশ্যের মনোহারিত্বে। যদিচ যা তিনি উপস্থিত করলেন তা অতীব মনোহারী তবু তা শেক্সসপীয়র রচিত নাটক নয়। শেক্সপীয়রের আবেদন তাঁর নাট্যকাব্যে, আর্ভিঙ প্রযোজিত নাটকের আবেদন চোখের তৃপ্তিতে। এই একই ঝোঁকের বশে হ্যামলেট নাটকের বিকৃতিসাধনেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর হাতে হ্যামলেট ভাবপ্রবণ প্রেমের ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। কিছু লোক অবশ্যই এই বিকৃতিসাধনে সচকিত হয়ে উঠলেন। বেনসন ও উইলিয়ম পোয়েল শেক্সপীয়রের প্রতি তাঁদের কর্তব্যবোধের তাড়নায় স্বতই তৎপর হয়ে উঠলেন। বেনসন ১৮৮৩ খৃঃ ভ্রাম্যমান নাটুকে দলের সাহায্যে নতুন ধারার উজ্জীবনে হলেন একাগ্র; সযত্নে পরিহার করলেন মূল নাটকের অঙ্গচ্ছেদ। দৃশ্যপটের ব্যবহারেরও দেখালেন অসাধারণ পরিমিতিবোধ। পোয়েল ১৮৯৫ খৃঃ স্থাপন করলেন এলিজাবেথীয় স্টেজ সোসাইটি। তাঁর উদ্দেশ্য শেক্সপীয়র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটকগুলিকে দৃশ্যপট ও বিরতি ব্যতিরেকেই মঞ্চে উপস্থিত করা। তবে আর্ভিঙ-প্রযোজিত ধারা ১৯০৫ খৃঃ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত হয় নি। এবং বিরভোম ট্রি দেখা দিলেন আর্ভিঙের উত্তরসাধক হিসাবে। ব্যক প্রযোজনায় আর্ভিঙকেও পরাস্ত করলেন। *Antony and Cleopetra*-এর অভিনয়ে মঞ্চে আনলেন সত্য ঝরণা। বাস্তবতার দিক থেকে তা

উপভোগ্য হলেও এর প্রয়োজনে মূল নাটককে কেটে ছেঁটে নাট্যবস্তুকে ব্যহত করে যে পদার্থ রূপায়িত করলেন সত্যকারের নাট্যরসিকের কাছে তা হাস্যকর বোধ হতে দেরী হল না। এই ধরনের নাট্যরূপে চোখের ওপর অতিআবেদনের ফলে নাটকের ভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি মনোযোগ বিন্যস্ত করা খুবই সুদূর ও দুরূহ। আর্ভিঙ বা ট্রি-র মনোভাব বোধকরি এই ছিল যে শেক্সপীয়রের নাটক তো অল্পবিস্তর সকলেরই জানা; তার মৌল আবেদনের সঙ্গেও সকলেই পরিচিত। সুতরাং যা বাকী আছে তা হল বিরাট বিরাট দৃশ্যপটের সাহায্যে চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিসাধন। অবশ্য এই ধরনের অতিবাস্তবতার বিরুদ্ধে রসিকরুচির বিদ্রোহ প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই দানা বেঁধে ওঠে। এই প্রসঙ্গে হারলি গ্র্যানভিল বার্কারের ভূমিকা অবশ্যই অগ্রগণ্য। তাঁর প্রযোজনা শেক্সপীয়র অভিনয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিগত একশত বছরের পর এই প্রথম তিনি শেক্সপীয়রের নাটককে বিনা পরিবর্তনে যথাযথভাবে উপস্থিত করলেন। বাদ দিলেন বিরাট মঞ্চৈশ্বর্যের অবতারণা ও অতিবাস্তবতার যথেচ্ছাচার। সামান্য কয়েকটি পটের সাহায্যে ও নাটকের ঘটনার দ্রুত স্রোতকে অব্যাহত রেখে দেখিয়ে দিলেন যে শেক্সপীয়র মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই নাটক লিখেছিলেন। ল্যাম-কথিত উক্তি যে নেহাত ভ্রান্ত তা বুঝতে আর কারু বাকি রইল না।

বার্কার মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও শেক্সপীরীয় যুগের মধ্যে একটি আপোষ করেই সাফল্য লাভ করেন। তাঁর সম্বল ছিল কয়েকটি পরিচিত পট ও একবার মাত্র বিরতি। এই সামান্য সম্বলেই ওয়েস্ট এণ্ডে স্থানীয় মঞ্চে দর্শকমনকে জয় করে নিলেন। ফল হল অসামান্য। এই ধারা প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই প্রসারলাভ করল ও পরে ওল্ড ভিক-এ এসে সুপ্রতিষ্ঠ হল। লণ্ডন শহরে শেক্সপীয়র অভিনয়ের তীর্থক্ষেত্র তো এখন এই থিয়েটর। এই প্রসঙ্গে বেন গ্রিট ও লিলিয়ান ব্যেলিসের নেতৃত্ব স্বতই মনে আসে। অভিনয়ে বার্কার-প্রদর্শিত ঐতিহ্যই সুপ্রতিষ্ঠ। পরে আরও কত দল ও অভিনেতার আবির্ভাব ঘটেছে; কিন্তু পুরনো ঐতিহ্য নতুন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পথ ধরেই প্রাগ্রসর। আধুনিক যুগের অভিনয়ে দুটি উপাদান বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমত শেক্সপীয়রের নাটকের মূল রূপকে অবিকৃত রাখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি। দ্বিতীয়ত তাঁর নাটকের মৌল আবেদনকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এলিজাবেথীয় যুগের মঞ্চের গঠন ও আবহাওয়ার প্রতি বিন্যস্ত মনোযোগ।

জওহরলাল নেহরুর
স্মৃতির উদ্দেশে